মুহম্মদ জাফর ইকবাল

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

মন জোগাতে নয়, মন জাগাতে
শুদ্ধস্বর ২০১৪

এখন তখন মানিক রতন। মুহম্মদ জাফর ইকবাল

গ্রন্থস্বত্ব © লেখক

প্রথম প্রকাশ প্রথম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
চতুর্থ মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রকাশক
আহমেদুর রশীদ চৌধুরী
শুদ্ধস্বর, বি-৬, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড, কাঁটাবন, ঢাকা
৯৬৬৬২৪৭, ০১৭১৬৫২৫৯৩৯
shuddhashar@gmail.com
www.shuddhashar.com

প্রচ্ছদ : সাদাত উদ্দিন আহমেদ এমিল

মূল্য : ২২০.০০ টাকা

ISBN 978-984-90750-0-4

Ekhon Tokhon Manik Roton by Muhammed Zafar Iqbal
A publication of Shuddhashar
First edition February 2014.

Price ৳ 220 $ 7 £ 5

উৎসর্গ

প্রফেসর মোহাম্মদ কায়কোবাদ
সালেহা সুলতানা (এমিলি)

দীর্ঘ প্রবাসজীবন শেষে দেশে ফিরে আসার পর আমার
জীবনে যে কয়টি আনন্দময় ঘটনা ঘটেছে তার মাঝে একটি
হচ্ছে এই দুজন মানুষের সাথে পরিচয়

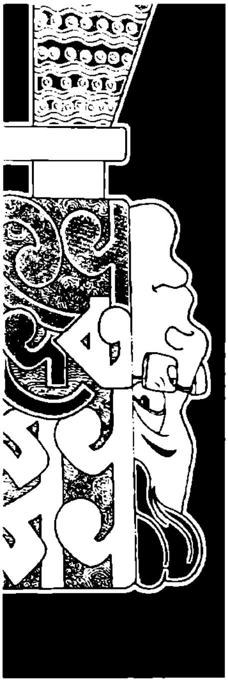

কুংফু গাড়ি ৯
ডুগডুগু ৩৭
কালাচান ধলাচান ৫৭
চেয়ার ১০১

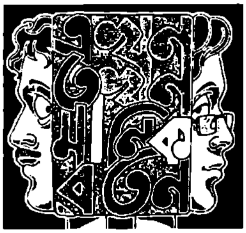

কুংফু গাড়ি

মানিকের সাথে রতনের পরিচয় হয়েছে প্রায় বছরখানেক আগে। মানিক হচ্ছে একজন কবি আর রতন হচ্ছে একজন বিজ্ঞানী, দুইজনের কাজকর্ম একেবারে আলাদা আলাদা জায়গায়। তাদের কখনো দেখা হওয়ার কথা না। মানিক যখন পুরানো বইয়ের দোকানে উইয়ে খাওয়া বই ঘেঁটে বেড়ায় রতন তখন পুরনো ঢাকার ধোলাইখালে ভাঙা যন্ত্রপাতি টানাটানি করে। বৃষ্টির দিনে মানিক যখন বিছানায় আধশোয়া হয়ে ঢুলুঢুলু চোখে কবিতা পড়ে রতন সেই সময় তার ল্যাবরেটরিতে কোনো একটা বিদঘুটে যন্ত্রের উপর উবু হয়ে বসে থাকে। গভীর রাতে মানিক যখন নিউজপ্রিন্টের কাগজে বলপয়েন্ট কলম ঘষে ঘষে উত্তর-আধুনিক কবিতা লেখার চেষ্টা করে রতন তখন কম্পিউটারের সামনে বসে জটিল কোনো যন্ত্রের ডিজাইন করে—কাজেই তাদের দুইজনের দেখা হওয়ার কোনো সুযোগই ছিল না। তারপরেও মানিক আর রতনের একদিন দেখা হয়ে গেল—আর যেভাবে দেখা হলো সেটা রীতিমতো একটা কাহিনি।

ঘটনাটা ঘটেছে এভাবে—মানিক সিলেটে গিয়েছে "তরুণ কবি সম্মেলনে", টানা দুইদিন আধাখ্যাপা শ খানেক কবির সাথে সময় কাটিয়ে ঢাকা ফেরত যাবার সময় ভাবল শ্রীমঙ্গলের বন থেকে একটু ঘুরে আসবে। সে যেহেতু একজন কবি মানুষ তাই তার গাছপালা-পাখি-প্রজাপতি-নদী-মাঠ-আকাশ-মেঘ এইসব দেখতে খুব ভালো লাগে। বেচারার কপাল খারাপ, থাকে ঢাকা শহরে তাই তাকে দেখতে হয় রাস্তা-ঘাট-বাস-টেম্পো-ট্রাফিক-জ্যাম আর বদমেজাজি মানুষ। শ্রীমঙ্গল যাবার জন্যে সে তার

শান্তিনিকেতনি ব্যাগটা ঘাড়ে ঝুলিয়ে বাসস্টেশনে হাজির হলো, রিকশা থেকে নামার আগেই চারদিক থেকে চারজন মানুষ তাকে ঘিরে ফেলে টানাটানি করতে থাকে। যেই মানুষটার গায়ে মোষের মতো জোর সে কনুই দিয়ে ধাক্কা মেরে অন্যদের সরিয়ে মানিককে ধরে টেনে হিঁচড়ে এনে জোর করে গাদাগাদি করে বোঝাই একটা বাসে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। মানিক ঘটনাটায় এত ভড়কে গেল যে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না। একটু পরে একটু শান্ত হয়ে নরম গলায় বলল, "ভাই, আমাকে এই বাসটিতে কেন তুলে দিলেন?" সে কবি মানুষ তাই কখনো গলা উঁচু করে না কখনো রেগে যায় না।

মোষের মতো মানুষটার অবশ্যি কিছুই শোনার সময় নেই, ঠিক তখন স্কুটার থেকে একজন মানুষ নামছিল তাকে ধরে আনার জন্যে সে ছুটে চলে গেল। মানিক তখন আবার অত্যন্ত ভদ্রভাবে শুদ্ধভাষায় নরম গলায় মিষ্টিভাবে বাসের হেলপারকে জিজ্ঞেস করল, "ভাই, আমাকে কেন এই বাসটিতে জোর করে তুলে দিল?"

হেলপার খুব মনোযোগ দিয়ে তার কেনে আঙুল দিয়ে প্রচণ্ডবেগে কান চুলকাচ্ছিল, সে একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "এইটা আবার কেমন প্রশ্ন? আপনি বাসে যাবেন সেই জন্যে বাসে তুলেছে। এরোপ্লেনে গেলে এরোপ্লেনে তুলত, জাহাজে গেলে জাহাজে তুলত—"

মানিক বলল, "কিন্তু আমি কোথায় যাব সেটি তো একবারও জানতে চাইলেন না ভাই।"

"সেইটা জানার দরকার কী? এই দেশে যাওয়ার জায়গা একটাই। ঢাকা। সবাই ঢাকা যায়। সবসময় ঢাকা যায়। সকালবেলা ঢাকা যায়, দুপুরবেলা ঢাকা যায়, সন্ধ্যাবেলা ঢাকা যায়—মাঝরাত্রেও ঢাকা যায়।"

"আমি তো ভাই ঢাকা যেতে চাইছি না। আমি যাব শ্রীমঙ্গল।"

"ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আপনারে আমাদের কোম্পানির শ্রীমঙ্গলের বাসে তুলে দিমু। ফাস্টক্লাস বাস, ওড়ায়া নিয়া যাব।"

মানিক কবি মানুষ তাই রাগ হতে পারল না, মিষ্টি করে বলল, "কিন্তু ভাই সেটা তো উল্টো দিকে যাওয়া হলো। তাছাড়া যে বাস রাস্তা দিয়ে

উড়ে যায় আমি তো সেই বাসে উঠতে চাই না। বাস যাবে রাস্তা দিয়ে, উড়ে কেন যাবে?"

হেলপার দ্বিগুণ বেগে তার কান চুলকাতে চুলকাতে বলল, "নেন, নেন, প্যাচাল পাইরেন না। যাইতে চাইলে যান না চাইলে নাইমা যান।"

মানিক তর্কবিতর্ক না করে নেমে গেল, তাকে নামতে দেখে অন্য বাসের কয়েকজন তাকে টানাটানি করার চেষ্টা করতে চাইছিল কিন্তু মানিক এবারে আগের থেকে সতর্ক ছিল বলে তারা সুবিধা করতে পারল না।

মানিক তখন শ্রীমঙ্গলের বাসগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। যে বাসগুলোর রঙ ক্যাটক্যাটে বেগুনি কিংবা বিদঘুটে হলুদ সেগুলো সে বাতিল করে দিল। কোনো বাসের ড্রাইভার কিংবা হেলপারের চেহারা পছন্দ না হলেও সে সেই বাসে উঠল না। শেষ পর্যন্ত সে যে বাসটাতে উঠল সেটা মোটামুটি সুন্দর একটা বাস, ড্রাইভারের চেহারায় এক ধরনের গাম্ভীর্য আছে, বাসের সিটগুলো নরম এবং একটু পা ছড়িয়ে বসার ব্যবস্থা আছে। মানিক জানালার কাছে আরাম করে বসে, বাস যখন চলতে থাকে তখন জানালা দিয়ে বাইরের মাঠঘাট নদী গাছ দুরন্ত কিশোর দেখতে তার খুব ভালো লাগে।

বাসটা ছাড়তে একটু দেরি হলো কিন্তু তাতে মানিকের কোনো সমস্যা হলো না, তার কখনো কোনো কিছুতে তাড়াহুড়া থাকে না। বাস যখন শহরটা পার হয়ে গ্রামীণ এলাকায় চলে এল তখন মানিকের ভেতর এক ধরনের শান্তি শান্তি ভাব চলে এল। কিছুক্ষণ সে মনে মনে জীবনানন্দ দাশের কবিতা আওড়াতে থাকে এবং তখন হঠাৎ করে তার মাথায় একটা কবিতার লাইন চলে আসে—"দেখা হবে ঘুংচিতে বেলা হবে অবেলা" কিন্তু সমস্যা হলো ঘুংচি বলে কোনো শব্দ তার জানা নেই। কিন্তু সেটাকে সে মাথা থেকে দূর করতে পারছিল না। যখন প্রায় একটা নতুন শব্দ মাথায় চলে আসছিলো ঠিক তখন হঠাৎ করে বাসটা রাস্তার পাশে থেমে গেল। হেলপার বাসের গায়ে থাবা মারতে মারতে বলল, "লামেন। লামেন। হগ্গলে লামেন।"

মানিক অশুদ্ধ ভাষা সহ্য করতেই পারে না প্রায় বলেই ফেলছিল "শব্দটা লামেন নয় শব্দটা নামেন—এবং হগ্গলে নয়—শব্দটা হচ্ছে সকলে"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত থেমে গেল কারণ সে দেখতে পেল প্যাসেঞ্জার এবং বাসের হেলপার আর কনডাক্টরের মাঝে একটু উত্তেজনার মতো ভাব হয়েছে। মানিক বাস থেকে নেমে জানতে পারল এই বাসটি আর যাবে না, সবাইকে নেমে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মুড়িরটিন মার্কা লক্কর-ঝক্কর বাসটিতে উঠতে হবে। সেই বাসটি শুধু যে মুড়ির টিন তাই নয় তার রং ক্যাটক্যাটে বেগুনি এবং দগদগে হলুদ। কাছে গিয়ে মানিক দেখল, ড্রাইভারের চেহারা ডাকাতের মতো, গলায় সোনার চেন, চোখ লাল, দাঁত কালো। মানিককে দেখে ড্রাইভার বলল, "উঠেন উঠেন, তাড়াতাড়ি ওঠেন। আরো দুই ট্রিপ মারতে হবে।"

মানিক মুখ শক্ত করে বলল, "আমি আপনার বাসে উঠব না।" ড্রাইভার তার কালো দাঁত বের করে হাসল, মানিক দেখল ড্রাইভারের শুধু যে দাঁত কালো তা নয় জিবটিও কালো। বলল, "না উঠে আপনার কুনো উপায় নাই। সব প্যাসেঞ্জারদের আমাদের কাছে বিক্রি করেছে।"

"বিক্রি করেছে? প্যাসেঞ্জার বিক্রি হয়?"

"জে বিক্রি হয়। পাইকারি খুচরা দুই রকমই বিক্রি হয়।"

ড্রাইভারের কথা শুনে মানিকের প্রথমবার একটুখানি রাগ উঠে গেল— রেগে গেলে তার কথায় কঠিন কঠিন শব্দ চলে আসে তাই সে বলল, "কিন্তু এটি গ্রহণযোগ্য নয়। এটি মানবাধিকার পরিপন্থী কুরুচিপূর্ণ নিয়ম বহির্ভূত কাজ—"

ড্রাইভার মানিকের কঠিন কঠিন শব্দগুলো না বুঝে মনে করল তাকে বুঝি গালাগাল করা হচ্ছে তাই সে চোখ পাকিয়ে বলল, "কী বললেন আপনি?"

মানিকের মনে হলো এখন তার এখানে থাকা ঠিক হবে না তাই সে সরে আগের বাসের কাছে চলে এল। তার ধারণা ছিল গিয়ে দেখবে প্যাসেঞ্জাররা বুঝি ততক্ষণে আরো খেপে উঠেছে, কিন্তু দেখল, ঠিক তার উলটো, প্যাসেঞ্জাররা নরম হয়ে নিজেদের জিনিসপত্র নামিয়ে লক্কর-ঝক্কর মুড়িরটিন বাসে উঠতে শুরু করেছে। কারণটাও সে অনুমান করতে পারল, বাসের ড্রাইভারের হাতে একটা লোহার রড, হেলপার আর কন্ডাক্টরের

হাতে দুইটা চ্যালা কাঠ। শুধু তাই নয়, আশেপাশে আরো কয়েকজন মানুষ নানা সাইজের গাছের ডাল নিয়ে ঘুরোঘুরি করছে।

অন্যেরা ভয় পেতে পারে কিন্তু মানিক কবি মানুষ তাকে তো ভয় পেলে চলবে না। সে গিয়ে গম্ভীর গলায় ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, "ড্রাইভার সাহেব কাজটা কি ঠিক হলো?"

ড্রাইভার ভুরু কুঁচকে বলল, "কোন কাজটা বেঠিক হয়েছে?"

এই ড্রাইভারের সম্ভ্রান্ত চেহারা দেখে মানিক বাসে উঠেছিল এখন এই ড্রাইভারকেই কেমন যেন সন্ত্রাসী সন্ত্রাসী দেখাতে থাকে। মানিক ঢোক গিলে বলল, "এই যে আমাদের সবাইকে বিক্রি করে দিলেন? আমি আপনাদের সুন্দর বাসে উঠেছিলাম—ঐ ভাঙাচোরা বাসে আমি উঠব না।"

ড্রাইভার তার হাতের লোহার রড হাত বদল করে বলল, "কিন্তু আমি তো আমার সুন্দর বাস নিয়া ঐ লাইনে যাইতে পারুম না। গতকাল একটা এসকিডেন্ট হলো—"

মানিক প্রায় বলেই ফেলছিল "শব্দটা এসকিডেন্ট নয়, শব্দটা এক্সিডেন্ট"। অনেক কষ্ট করে নিজেকে থামাল।

হেলপার তার চ্যালাকাঠ নিয়ে এগিয়ে আসে, "পত্রিকায় দেখেন নাই? একটা টেম্পু ফিনিস?" তার চোখমুখ ভালো একটা এক্সিডেন্ট করার গর্বে ঝলমল করতে থাকে।

ড্রাইভার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "এখন ঐ লাইনে গেলে আমার খবর আছে। দুই চারদিন যাক, অবস্থা ঠান্ডা হোক।"

মানিক মুখ শক্ত করে বলল, "কিন্তু আমি ঐ উৎকট বেগুনি হলুদ রঙের বাসে উঠব না। কিছুতেই উঠব না।"

"না উঠলে নাই। কোম্পানির পলিসি প্যাসেঞ্জারদের জায়গা মতন পৌঁছায়া দেওয়া কিন্তু ভাড়া ফেরত দেওয়ার নিয়ম নাই।"

মানিক গম্ভীর গলায় বলল, "আমি মোটেও ভাড়া ফেরত দিতে বলিনি। আমি শুধু আপনাদের কাছে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে প্রতিবাদ করলাম।" কথা শেষ করে মানিক চলে এল, সে দেখতে পেল না যে বাসের ড্রাইভার হেলপার আর কন্ডাক্টরের হাত দিয়ে মাথার মাঝে ইঙ্গিত

করে একে অন্যকে বোঝাল যে মানিকের মাথায় গোলমাল আছে। তারপর তিনজন মিলে আনন্দে হা হা করে হাসল সেটাও মানিক দেখতে পেল না।

বাস দুটো ছেড়ে দেবার পর মানিকের মনে হলো কাজটা বোধ হয় ঠিক হলো না, কষ্ট করে হলেও লালচোখ কালো দাঁত ড্রাইভারের লক্কর-ঝক্কর হলুদ বেগুনি বাসে চলে যাওয়া উচিত ছিল। যেখানে তাদের নামিয়েছে তার আশেপাশে কিছু নেই, শুধু রাস্তা দিয়ে মাঝে মধ্যে হুশহাশ করে একটা দুইটা বাস ট্রাক গাড়ি চলে যাচ্ছে। মানিক তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাঁটতে শুরু করে, আর কিছু না হোক হাঁটতে হাঁটতে ঘুংচির বদলে একটা অন্য শব্দ নিশ্চয়ই বের হয়ে যাবে।

ঠিক যখন ঘুংচি শব্দটার একটা ভালো প্রতিশব্দ মাথায় প্রায় চলে আসছিল তখন কোথা থেকে একটা গাড়ি হুশ করে এসে ঠিক তার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। গাড়িটার মাঝে কিছু-একটা অন্যরকম ব্যাপার আছে যেটা সে ঠিক ধরতে পারল না। গাড়িটা ছোটো এবং পুরানো রং-ওঠা এবং বিবর্ণ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি একটা বড়ো সাইজের খেলনা গাড়ি। গাড়িটা ছোটো হলেও সেটা বিকট শব্দ করে এবং পিছন থেকে গলগল করে কুচকুচে কালো ধোঁয়া বের হয়। গাড়িটা কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল আর তখন ভেতর থেকে উশকোখুশকো চুলের একজন মানুষ বের হয়ে এলো। মানুষটার গায়ের রং ফর্সা এবং নাকের নীচে ঝাঁটার মতো গোঁফ। মানিক দুই চোখে গোঁফ দেখতে পারে না, তার অনেকদিন থেকে ইচ্ছা সে গোঁফওয়ালা কোনো মানুষকে জিজ্ঞেস করবে সর্দি হলে তারা কেমন করে নাক ঝাড়ে, নাকের নীচে গোঁফগুলো কোনো ঝামেলা তৈরি করে কি না।

গাড়ি থেকে গোঁফওয়ালা ফর্সামতো উশকোখুশকো চুলের যে মানুষটা বের হয়েছে সেই হচ্ছে রতন কিন্তু মানিক তখনো সেটা জানত না।

রতন গাড়ি থেকে বের হয়ে এদিক সেদিক তাকাল এবং মনে হলো হঠাৎ করে মানিককে দেখতে পেল, তখন সে মানিকের দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "আপনার কাছে কি চিউইংগাম আছে?"

মানিক থতমত খেয়ে গেল, অচেনা জায়গায় বিচিত্র একটা গাড়ি থেকে আজব একটা মানুষ হঠাৎ করে বের হয়ে যদি জিজ্ঞেস করে তার কাছে চিউইংগাম আছে কি না তাহলে থতমত খাওয়ারই কথা। সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "না। আমার কাছে চিউইংগাম নেই। কখনো থাকে না।"

"ও!" রতন মনে হলো খুবই বিরক্ত হলো। খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তাহলে কি একটা এক টাকার কয়েন হবে?"

মানিক একটু অবাক হয়ে বলল, "না। আমার কাছে পাঁচ টাকার নোট আছে।"

"আমি নোট চাই নাই।" রতন মুখ শক্ত করে বলল, "আমি বলেছি এক টাকার কয়েন। তার কারণ এক টাকার কয়েন মেটালের তৈরি, গোল, আর ইলেকট্রিসিটি কনডাক্ট করে, সিল করার জন্যে পারফেক্ট।"

কথা শেষ করে রতন এমনভাবে মানিকের দিকে তাকাল যেন মানিক একটা ছাগল কিংবা লাইটপোস্ট। মানিক কবিমানুষ—সে সহজে রাগে না, গলার স্বর উঁচু করে না। তারপরেও এই বেয়াদব মানুষটার কথা শুনে তার একটু রাগ হলো। অনেক কষ্ট করে গলার স্বরটা ঠান্ডা রেখে বলল, "আপনি কি ঘুংচি শব্দটার একটা ভালো প্রতিশব্দ বলতে পারবেন?"

রতন হকচকিয়ে গেল, জিজ্ঞেস করল, "কী বললেন?"

"বলেছি আপনি কি ঘুংচি শব্দটার একটা ভালো প্রতিশব্দ বলতে পারবেন?"

"ঘুংচি?"

"হ্যাঁ।"

"ঘুংচি মানে কী?"

"কোনো মানে নাই। সেইজন্যেই তো প্রতিশব্দ খুঁজছি।"

রতন এবারে অনেকক্ষণ মানিকের দিকে তাকিয়ে ভালো করে তাকে লক্ষ করল। উদাস উদাস চেহারা, গায়ে সুন্দর ফতুয়া, চোখে চশমা কাঁধে ঝোলানো বাহারি শান্তিনিকেতনি ঝোলা। দেখে মনে হয় না তার মাথায় গোলমাল আছে কিন্তু কথা শুনে রতনের সেরকমই মনে হচ্ছে। রতন ভুরু

কুঁচকে বলল, "আপনি আমার কাছে ঘুংচি শব্দের অর্থ জানতে চাইছেন কেন? আমি কেমন করে জানব?"

"আপনি আমার কাছে চিউইংগাম চাইতে পারেন আর আমি আপনার কাছে ঘুংচির প্রতিশব্দ চাইতে পারব না?"

"চিউইংগাম আর ঘুংচি এক হলো?"

"চিউইংগাম থেকে ঘুংচি একশ গুণ ভালো।" মানিক কষ্ট করে মেজাজ ঠান্ডা রেখে বলল, "চিউইংগাম খায় অমার্জিত বর্বর মানুষেরা। মানব সভ্যতায় দুটি বড়ো বিষফোঁড়ার একটি হলো টেলিভিশন অন্যটি চিউইংগাম। বুঝেছেন? আর ঘুংচি হচ্ছে একটা নির্দোষ শব্দ।"

রতন তার কোমরে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থেকে বলল, "আপনি কি কখনো ডাক্তার দেখিয়েছেন?"

মানিক এবার সত্যি সত্যি রেগে উঠল, বলল, "কী বললেন?"

"আমি জিজ্ঞেস করছি আপনি কি কখনো ডাক্তার দেখিয়েছেন? আমার মনে হয় আপনার ব্লাড প্রেশারের সমস্যা আছে। কিংবা হয়ত ব্রেনে গোলমাল আছে। কিংবা অন্য জেনেটিক সমস্যা আছে। তা না হলে আমার একটা সোজা প্রশ্নের উত্তরে কেউ এত কথা বলে?"

"কী বললেন?" মানিক মেঘের মত গর্জন করে বলল, "আমি বেশি কথা বলি?"

"সবসময়ে বলেন কি না জানি না। কিন্তু এখন বলছেন।"

মানিক কিছুক্ষণ সরুচোখে রতনের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলে বলল, "আমার মনে হয় কী জানেন? আমার মনে হয় আপনারই ব্লাড প্রেশার আছে। শুধু ব্লাড প্রেশার নয় আপনার প্লীহারও প্রেশার আছে।"

রতন থতমত খেয়ে বলল, "প্লীহার প্রেশার?"

"হ্যাঁ।"

"প্লীহা কী?"

"আমি জানি না।"

রতন অবাক হয়ে বলল, "আপনি জানেন না? তাহলে যে বললেন?"

"বলেছি তো কী হয়েছে? একটা জিনিস না জানলে সেটা বলা যাবে না?"

"একটা জিনিস না জানলে কেন সেটা বলবেন?

"আমরা বলি। সবসময় বলি। যে শব্দটা আমি জানি সেটা বলি, যেটা জানি না সেটাও বলি। যে শব্দ পৃথিবীতে নেই আমরা সেই শব্দ তৈরি করে সেটাও বলি।"

রতন কিছুক্ষণ অবাক হয়ে মানিকের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "ঘুংচুর মতন?"

"হ্যাঁ। ঘুংচুর মতন।"

"আপনারা কারা?"

"আমরা কবি।"

"সত্যিকারের কবি?"

মানিক মুখ শক্ত করে বলল, "কবি কখনো মিথ্যাকারের হয় না। কবি মানেই সত্যিকারের কবি।"

রতন বলল, "আমি এর আগে সামনাসামনি কখনো কোনো কবি দেখি নাই।" চোখ বড়ো বড়ো করে মানিকের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "কবিরা তাহলে এরকম হয়? আমি ভেবেছিলাম—" রতন হঠাৎ কথার মাঝখানে থেমে গেল।

মানিক বলল, "কী ভেবেছিলেন?"

"আমি ভেবেছিলাম কবিদের লম্বা লম্বা উশকোখুশকো চুল আর দাড়ি হয়। লাল লাল চোখ হয়। ময়লা পাঞ্জাবি পরে থাকে। মাথার চুলে—" রতন আবার কথার মাঝখানে থেমে গেল।

মানিক জিজ্ঞেস করল, "মাথার চুলে কী?"

"মাথার চুলে উকুন হয়।"

মানিক মুখ শক্ত করে বলল, "আপনাদের এটা খুবই ভুল ধারণা। কবিরা মোটেই নোংরা খবিশ না। কবিরা সুন্দরের পূজারি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং পূত পবিত্র। নোংরা খবিশ কারা জানেন?"

"কারা?"

"বৈজ্ঞানিকেরা। তাদের দশ হাতের মাঝে আপনি যেতে পারবেন না। শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হয়।"

রতন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "দুর্গন্ধ বের হয়?"

"হ্যাঁ। গোসল করে না তো—দুর্গন্ধ বের হবে না তো কী বের হবে? তার উপর তাদের কথাবার্তা হয় চাছাছোলা কাঠখোট্টা রুক্ষ। তারা অসামাজিক, কারো সাথে মিশতে পারে না। চোখের নীচে থাকে কালি, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, নখের নীচে ময়লা—"

রতন তখন তার হাত মেলে তার নখের নীচে দেখল, কিছু বলল না।

মানিক বলল, "বৈজ্ঞানিকদের বিয়ে হয় না। কোনো মেয়ে বৈজ্ঞানিকদের বিয়ে করতে রাজি হয় না। যদি বা বিয়ে করে, সেই বিয়ে বেশিদিন টেকে না—ডিভোর্স হয়ে যায়।"

রতন দুর্বল গলায় বলল, "আ-আপনি কীভাবে জানেন?"

"না জানার কী আছে? সবাই জানে। আমার কথা বিশ্বাস না করলে একটা বৈজ্ঞানিক খুঁজে বের করেন—"

রতন নিশ্বাস ফেলে বলল, "খুঁজে বের করতে হবে না।"

"কেন?"

"আমি নিজেই একজন বৈজ্ঞানিক।"

মানিক থতমত খেয়ে বলল, "আ-আপনি বৈজ্ঞানিক?"

"হ্যাঁ। ছোটোখাটো একজন পাতি বৈজ্ঞানিক।"

"আপনি কী কী আবিষ্কার করেছেন?"

রতন বলল, "ছোটোখাটো জিনিসপত্র। যেমন এই হাতঘড়িটা আসলে একই সাথে হাতঘড়ি আর ব্লাডপ্রেশার মাপার যন্ত্র। আমার শার্টটা সোলার সেল, এই যে রোদে দাড়িয়ে আছি ব্যাটারি চার্জ হচ্ছে।" রতন চশমাটা দেখিয়ে বলল, "এই চশমাটা একইসাথে চশমা আর কম্পিউটার মনিটর। আর এই যে আংটিটা দেখছেন, এটা আসলে আংটি না, কম্পিউটারের মাউস।"

মানিক ঢোক গিলে বলল, "ক-কম্পিউটার কোথায়?"

"ছোটোগুলো শার্টের কলারে। বড়োগুলো গাড়িতে।"

"বড়োগুলো মানে? কয়টা কম্পিউটার গাড়িতে?"

"প্রত্যেকটা চাকার জন্যে একটা, স্টিয়ারিং হুইলে একটা, কন্ট্রোলের জন্যে একটা।"

মানিক চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, "এই গাড়ি কোথায় পেলেন?"

"কোথায় পাব? আমার কি গাড়ি কেনার পয়সা আছে?"

"তাহলে?"

"বানিয়ে নিয়েছি।"

"গা-গা-গাড়ি বানিয়েছেন?"

"হ্যাঁ। বেশি ভালো হয় নাই কিন্তু কাজ করে।"

মানিক গাড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল, "শব্দ মনে হয় একটু বেশি করে—কিন্তু শব্দই যদি না করল তাহলে কীসের গাড়ি?"

রতন মাথা নাড়ল, বলল, "আসলে এই গাড়ি কোনো শব্দ করে না। ইলেকট্রিক গাড়ি তো—শব্দ নাই। কিন্তু শব্দ না থাকলে মানুষজন সন্দেহ করে—তাই শব্দের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। শব্দ আর ধোঁয়া।"

"ধোঁয়াটাও বানানো?"

"হ্যাঁ।"

"কী আশ্চর্য!" মানিক এবারে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে রতনের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আপনাকে দেখে বৈজ্ঞানিকদের সম্পর্কে আমার ধারণাই পালটে গেল! আমি আরো ভাবতাম বৈজ্ঞানিকেরা খালি কাগজে লম্বা লম্বা সমীকরণ লিখে। আপনি তো দেখি অসাধারণ!"

রতন দুর্বলভাবে মাথা নেড়ে বলল, "আরে না! অসাধারণ হলো কীভাবে? যদি আবিষ্কার করতাম ই ইকুয়েল টু এম সি স্কয়ারের মতো এক সূত্র তাহলে বলতেন অসাধারণ।"

মানিক ভুরু কুঁচকে বলল, "ই ইকুয়েল টু কী?"

"এম সি স্কয়ার।"

"আবিষ্কার হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। আইনস্টাইন আবিষ্কার করেছেন।"

"তাতে কী হয়েছে! সি শেষ হয়েছে তো কী হয়েছে, ডি তো আছে আপনি আবিষ্কার করবেন ই ইকুয়েল টু এম ডি স্কয়ার!"

রতন খানিকক্ষণ মানিকের দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে একটা বড়ো নিশ্বাস ফেলল। মনে মনে ভাবল, ভাগ্যিস আইনস্টাইন এই কথাগুলো শোনার জন্যে বেঁচে নেই।

মানিক অবশ্যি এতকিছু খেয়াল করল না, সত্যিকারের একজন বৈজ্ঞানিককে দেখে সে মহাখুশি। হাত পা নেড়ে বলল, "আপনি একটু আগে চিউইংগাম খেতে চেয়েছিলেন না? চলেন ঐ দোকানে যাই—চিউইংগাম না থাকলেও লজেন্স চকলেট কিছু-একটা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।"

রতন বলল, "না, না—আমি খাওয়ার জন্যে চিউইংগাম খুঁজছি না।"

"তাহলে?"

"লুব্রিকেশানের ট্যাঙ্কটা লিক করছে। একটা চিউইংগাম থাকলে চিবিয়ে নরম করে টিপে লাগিয়ে দিলে লিকটা বন্ধ হয়ে যেত।"

মানিক মুখ হা করে বলল, "অ! আর এক টাকার কয়েন?"

"ব্যাটারির কন্টাক্টটা ক্ষয়ে গেছে। কয়েনটা ঢুকিয়ে স্ক্রু টাইট দিলেই কাজ কমপ্লিট।"

মানিক বলল, "আপনি চিন্তা করবেন না, আমি ঐ দোকান থেকে চিউইংগাম কয়েন সব জোগাড় করে দেব।"

"থ্যাংকু।"

"আসেন আমার সাথে।"

দোকানে চিউইংগাম পাওয়া গেল না কিন্তু রতন চুনের সাথে চিনি মিশিয়ে বিচিত্র এক ধরনের আঠা তৈরি করে তার লুব্রিকেন্ট ট্যাঙ্কের লিক সারিয়ে ফেলল। দোকান থেকে কয়েন ভাঙিয়ে নিয়ে ব্যাটারির কানেকশান লাগিয়ে রতন সেটাও ঠিক করে ফেলল। রতন তার গাড়িতে উঠতে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনি কোথায় যাবেন?"

"শ্রীমঙ্গল।"

"আমিও ঐ রাস্তাতেই যাচ্ছি, আপনাকে আমি আমার গাড়িতে তুলে নিতে পারতাম। কিন্তু—" রতন কথা শেষ না করে থেমে গেল।

"কিন্তু কী?"

"আমার মনে হয় সেটা ঠিক হবে না।"

"কেন?"

"আপনি ভয় পাবেন। এর আগে যাকে তুলেছিলাম তার একটা ছোটো হার্ট এটাকের মতো হয়েছিল।"

"কেন?"

"আমি যেভাবে গাড়ি চালাই সেটা সবাই সহ্য করতে পারে না।"

"কীভাবে গাড়ি চালান?"

"ঠিক বলে বোঝানো যাবে না। নিজের চোখে দেখলে হয়ত একটু অনুমান করা যায়।"

মানিক বলল, "আমাকে দেখান।"

রতন বলল, "ভয় পাবেন না তো?"

"না পাব না।"

"হার্ট এটাক হবে না তো?"

"না। আমার হৃদয় হচ্ছে কবির হৃদয়। কবির হৃদয় কখনো কাউকে হতাশ করে না। সেটি ফুলের মতো কোমল আবার পাথরের মতো শক্ত।"

"ঠিক আছে, তাহলে ওঠেন।" রতন মানিকের জন্যে দরজা খুলে দিল, বলল, "ভয় পেলে পরে আমাকে দোষ দেবেন না।"

মানিক গাড়ি উঠেই বুঝতে পারল এটা অন্যরকম গাড়ি। ভেতরে নানারকম বিচিত্র যন্ত্রপাতি। ড্যাশবোর্ডে ছোটো ছোটো অনেকগুলো মনিটর। নানারকম সুইচ, নানারকম লিভার। রতন একটা সুইচ টিপে দিতেই বিকট শব্দ করতে শুরু করল, আরেকটা সুইচ টিপে দিতেই পিছন দিয়ে কালো ধোঁয়া বের হতে থাকে। রতন সন্তুষ্টির মতো ভঙ্গি করে বলল, "শব্দ আর ধোঁয়া দিয়ে দিয়েছি এখন গাড়িটা স্টার্ট করা যায়।"

রতন আরেকটা সুইচ টিপে দিতেই গাড়িটা চলতে শুরু করে, সে স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে গাড়িটা রাস্তায় নিয়ে এসে মানিকের দিকে তাকিয়ে বলল, "ভয় পাচ্ছেন না তো?"

"না, না। ভয় পাব কেন?"

"আমার ড্রাইভিং দেখে অনেকে ভয় পায়।"

মানিক রতনের গাড়ি চালানো লক্ষ করতে করতে বলল, "ভয় পাওয়ার কী আছে? আপনি তো বেশ ভালো গাড়ি চালান।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"আমার ড্রাইভিংয়ের ওপর কি আপনার বিশ্বাস আছে?"

"থাকবে না কেন? অবশ্যই আছে।"

"ঠিক আছে। তাহলে দেখা যাক।" বলে রতন এক্সেলেটর চেপে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল, গাড়িটি এত জোরে যাচ্ছে যে এবারে রীতিমতো কাঁপতে থাকে। মানিক দুর্বলভাবে বলল, "একটু বেশি জোরে চালাচ্ছেন না?"

"হ্যাঁ। বেশি স্পিডে এখনো টেস্ট করা হয়নি।"

"কী টেস্ট করা হয়নি?"

ঠিক তখন সামনের দিক থেকে একটা দৈত্যের মতো ট্রাক আসতে থাকে, ট্রাকটার জন্যে রাস্তা ছেড়ে না দিয়ে রতন তার গাড়িটাকে বরং রাস্তার মাঝখানে নিয়ে আসে। মানিক ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী করছেন? সাইড দেন।"

"মজাটা দেখেন আগে!" বলে রতন স্টিয়ারিং হুইলটা ছেড়ে দিয়ে দুই হাত মাথার উপর তুলে ফেলে। মানিক আতংকে চিৎকার করে বলল, "কী করছেন আপনি?"

রতন বলল, "গাড়ি চালাচ্ছি।"

উলটো দিক থেকে ট্রাকটা বিকট হর্ন বাজাতে বাজাতে ছুটে আসছে, রাস্তার পাশে সরে গিয়ে জায়গা করে দেবার জন্যে হেডলাইট জ্বালিয়ে নিভিয়ে সিগন্যাল দিতে থাকে কিন্তু মানিকের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। সে স্টিয়ারিং হুইল ছেড়ে দিয়ে দুই হাত উপরে তুলে হাত তালি দিতে থাকে। মানিক হঠাৎ করে বুঝতে পারল, না বুঝে সে আসলে একজন বদ্ধ পাগলের গাড়িতে উঠে পড়েছে। ঠিক যখন মুখোমুখি কলিশন হবে তার আগের মুহূর্তে রতনের গাড়িটা ঝাঁকুনি দিয়ে বাম পাশে সরে গিয়ে হুশ করে ট্রাকটাকে বের হয়ে যেতে দিল। মানিকের তখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে সে বেঁচে আছে, তার চাইতে অবাক ব্যাপার রতন এখনো স্টিয়ারিং হুইল ধরেনি, গাড়িটা নিজে নিজে চলছে।

মানিক দুই হাতে বুক চেপে ধরে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, "কী হচ্ছে এখানে?"

রতন দুই হাত ভাঁজ করে মাথার পিছনে নিয়ে আরাম করে বসে বলল, "কী আবার হবে? গাড়ি চলছে।"

"কেমন করে চলছে?"

"নিজে নিজে চলছে। এটা হচ্ছে আমার সর্বশেষ আবিষ্কার—ড্রাইভিং সফটওয়্যার। টেস্ট করার জন্যে গাড়িতে লোড করে বের হয়েছি।"

মানিক বড়ো বড়ো নিশ্বাস নিতে নিতে বলল, "প্লিজ, গাড়িকে নিজে নিজে চলতে দিয়েন না। গাড়ি কখনো নিজে নিজে চলতে পারে না। স্টিয়ারিংটা হাত দিয়ে ধরেন। প্লিজ ধরেন।"

রতন হাসি হাসি মুখ করে বলল, "ধরতে হবে না। আমি যতো ভালো গাড়ি চালাতে পারি, আমার ড্রাইভিং সফটওয়্যার তার থেকে একশগুণ ভালো গাড়ি চালায়!"

মানিক ভাঙা গলায় বলল, "তবুও আপনি স্টিয়ারিংটা ধরেন দোহাই লাগে—"

রতন দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, "আমি বলেছিলাম না আপনি ভয় পাবেন। এখন বিশ্বাস হলো?"

"আপনি আমাকে নিয়ে সুইসাইড করলে আমি ভয় পাব না?"

রতন দূরে তাকিয়ে বলল, "ঐ দেখেন একটা বাস আসছে! বাস ড্রাইভারকে এখন জন্মের মতো শিক্ষা দেয়া হবে!"

"কসম লাগে। আপনার কসম লাগে কাউকে শিক্ষা দিতে হবে না!"

রতন মানিকের কথায় কান দিল না। বলল, "বাস ড্রাইভারগুলো সবচেয়ে বড়ো বেয়াদব, ছোটো গাড়িগুলোকে সাইড দেয় না, রাস্তা থেকে নামিয়ে দেয়। আজকে তার শিক্ষা হবে।"

"কী শিক্ষা হবে?"

"আমার ড্রাইভিং সফটওয়্যার সাইড দেবে না।"

মানিক আর্তনাদ করে বলল, "সর্বনাশ!"

"ব্যাটাকে বাধ্য করা হবে সাইড দিতে!" রতন আনন্দে হা হা করে হাসল।

মানিক দুই হাতে নিজের বুক চেপে ধরে বলল, "প্লিজ, ওটা করবেন না। বাস যদি সাইড না দেয়—তাহলে? তাহলে কী হবে?"

"একেবারে শেষ মুহূর্তে কলিশনের দুই দশমিক তিন মিলিসেকেন্ড আগে আমার গাড়ি ঝটকা মেরে সরে যাবে।"

"যদি যেতে না পারে?"

"পারবে। নতুন অপারেটিং সিস্টেমে প্রোগ্রাম লোড করেছি—"

মানিক বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে, তাদের গাড়িটা সোজা বাসটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সামনে থেকে হর্ন দিতে দিতে বাসটা এগিয়ে আসছে—শুধু হর্ণ দিয়েই থামেনি হেডলাইট জ্বালাচ্ছে নিভাচ্ছে। রতন খিক খিক করে হেসে বলল, "সরে যাও বাছাধন সরে যাও—"

মানিক আতঙ্কে চোখ বন্ধ করল, টের পেল সত্যি সত্যি শেষ মুহূর্তে গাড়িটা ঝটকা মেরে সরে গেছে। রতন আনন্দে হা হা করে হাসতে হাসতে বলল, "বিশ্বাস হলো?"

মানিক মাথা নাড়ল, "না হয়নি।"

"কেন হয়নি?"

"এটা কোনোদিন বিশ্বাস হবে না।"

"হবে হবে।" রতন মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "আপনি তো ভয়ের চোটে চোখ বন্ধ করে ফেললেন তাই দেখতে পেলেন না ব্যাটা ড্রাইভার ভয়ের চোটে রাস্তা ছেড়ে দিয়েছিল! না দিয়ে যাবে কোথায়?"

মানিক চিঁ চিঁ করে বলল, "আপনি বলেছিলেন না আপনার পরিচিত একজন এই গাড়িতে উঠে হার্ট এটাক হয়েছিল?"

"হ্যাঁ।"

আমারও মনে হয় হার্ট এটাক হচ্ছে। বুকের মাঝে কেমন জানি চাপ লাগছে। শরীরটা মনে হয় ঘামছে।"

রতন মানিকের দিকে একনজর তাকিয়ে বলল, "না। আপনার মোটেও হার্ট এটাক হচ্ছে না।"

"আপনি কেমন করে জানেন? নিশ্চয়ই হচ্ছে।"

রতন হাত দিয়ে ড্যাশবোর্ডের একটা মনিটর দেখিয়ে বলল, "এই দেখেন আপনার ইসিজি। পরিষ্কার সিগন্যাল। আপনার লোহার মতো শক্ত হার্ট।"

"আ-আ-আমার ইসিজি?"

"হ্যাঁ। সিট বেল্টের সাথে অনেক মনিটর লাগানো আছে। আপনার হার্ট পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।"

মানিক বলল, "ঠিক আছে। হার্ট এটাক না হলে নাই—আপনি আমাকে নামিয়ে দিন। আমি এই গাড়িতে থাকব না। এক সেকেন্ডও থাকব না।"

"কেন?"

"কেন? এটা আবার জিজ্ঞেস করতে হয়? আপনি বুঝতে পারছেন না কেন? প্লিজ গাড়ি থামিয়ে আমাকে নামিয়ে দিন। প্লিজ! প্লিজ!"

রতন মাথা চুলকাল, বলল, "আপনাকে নামিয়ে দিতাম—কিন্তু আমার ড্রাইভিং সফটওয়্যারে ছোটো একটা বাগ রয়ে গেছে, এখনো ঠিক করা হয়নি!"

"বাঘ? সফটওয়ারে বাঘ?"

"বাঘ না, বাঘ না, বাগ। সফটওয়ারের সমস্যাকে বলে বাগ!"

আপনার সফটওয়্যারে সমস্যা আছে সেই সমস্যাওয়ালা সফটওয়ার দিয়ে আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন? থামান গাড়ি—এখনই থামেন।"

"সেটাই তো সমস্যা।"

"মানে?"

"গাড়ি তো থামাতে পারি না।"

মানিক আর্তনাদ করে বলল, "গাড়ি থামাতে পারেন না?"

"উহুঁ।"

"তাহলে? বাকি সারাজীবন এই গাড়িতে থাকতে হবে?"

রতন হাসল, বলল, "না, না! বাকি জীবন কেন থাকতে হবে! আমি গন্তব্য লোড করে দিয়েছি, গন্তব্যে পৌঁছে গেলে নিজে থেকে থেমে যাবে।"

"গন্তব্যে কখন পৌঁছাব?"

"এই তো ঘণ্টাখানেকের মাঝে"

"ঘণ্টাখানেক? ঘণ্টাখানেক?" মানিক হাহাকার করে বলল, "আমি তার আগেই মরে যাব। নির্ঘাত মরে যাব। আর যদি মারা না যাই তাহলে পাগল হয়ে যাব। উন্মাদ হয়ে যাব। স্মৃতি বিভ্রম হয়ে যাবে। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হবে।"

"কিছুই হবে না।"

"হবে। আমি জানি।" মানিক আর্তনাদ করে বলল, "হবে। আজকেই হবে। এক্ষুনি হবে।"

রতন কিছুক্ষণ মানিকের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি সত্যিই নেমে যেতে চান?"

মানিক দ্রুত মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। হ্যাঁ।"

"একটা উপায় আছে।"

মানিক চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, "কী উপায়?"

"আমি দরজাটা খুলে গাড়ির হুডের উপর উঠে হুডটা খুলে ব্যাটারির কানেকশানটা যদি খুলে দেই—"

"গাড়ি চলন্ত অবস্থায়?"

"হ্যাঁ। চলন্ত অবস্থায়। সেটা কোনো সমস্যা না। আমার গাড়ির সামনে দুইটা ক্যামেরা তিনটা ছোটো রাডার আছে। দুইটা ইনফ্রারেড লাইটের সোর্স আর ডিটেক্টর—সেইসব সিগন্যাল দিয়ে এই গাড়ি পৃথিবীর যে কোনো ড্রাইভার থেকে ভালো গাড়ি চালায়। কাজেই আমি দরজা খুলে হুডের উপর উঠে গেলে কোনো সমস্যা নেই।"

"রাস্তার মানুষজন যখন দেখবে গাড়ির ড্রাইভার হুডের ওপর বসে আছে তখন কী হবে?"

"কী হবে?" রতন জিজ্ঞেস করল, "দেখলে কী হবে?"

"তারা অবাক হবে না?"

রতন বলল, "মনে হয় না। এই দেশের মানুষ কোনো কিছুতে অবাক হয় না।" রতন গাড়ির দরজা খুলে বের হওয়ার চেষ্টা করতেই মানিক খপ করে তাকে ধরে ফেলল। রতন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

মানিক কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, "আর কোনো উপায় নেই?"

রতন মাথা চুলকে বলল, "আরেকটা উপায় আছে।"

"সেটা কী?"

"যদি আপনি খুব জোরে চিৎকার করেন তাহলে গাড়িটা থেমে যেতে পারে।"

"চিৎকার করলে?"

"হ্যাঁ। তখন সিকিউরিটি সিস্টেম মনে করবে একটা ইমার্জেন্সি হয়েছে। আর সেইজন্যে গাড়িটা থামাবে।"

"কী বলে চিৎকার করতে হবে?"

রতন বলল, "যা ইচ্ছে বলতে পারেন!"

"যা ইচ্ছে?"

"হ্যাঁ।"

"বাবাগো মাগো বলতে পারি? বাঁচাও বাঁচাও?"

"যা ইচ্ছে। চেষ্টা করেন।"

মানিক তখন "বাবাগো মাগো, মেরে ফেলল গো, বাঁচাও বাঁচাও" বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে শুরু করল। রতন মাথা নাড়ল, বলল, "হচ্ছে হচ্ছে। সিস্টেম পিক আপ করছে। আরেকটু জোরে।"

মানিক তখন আরো জোরে জোরে গগনবিদারী চিৎকার করল, "ও বাবাগো ও মাগো! বাঁচাও আমাকে বাঁচাও। আমাকে মেরে ফেলল গো আমার কী হবে গো! আমার কী সর্বনাশ হলো গো! বাঁচাও বাঁচাও।"

আর গাড়িটা ঠিক তখন থেমে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে গেল। রতন বলল, "আপনি এখন থামতে পারেন।"

মানিক কোনো ঝুঁকি নিল না, আরো জোরে চিৎকার করতে লাগল, "ও বাবাগো! ও মাগো! মেরে ফেললো গো!"

রতন বলল, "থামেন থামেন! এখন চিৎকার করলে বিপদ হয়ে যাবে।"

মানিক থামল, কিন্তু ততক্ষণে বিপদ হয়ে গেছে। গাড়ি যেখানে থেমেছে ঠিক সেইখানে কিছু পুলিশ দাঁড়িয়েছিল। তারা দৌড়ে এসে গাড়িটা ঘিরে ফেলল। একজন রাইফেল তুলে বলল, "হ্যান্ডস আপ। হাত

তুলে গাড়ি থেকে নেমে আস। একটু তেড়িবেড়ি করলেই গুল্লি। সোজা ক্রসফায়ার।"

রতন বলল, "কেন? কী হয়েছে?"

"কী হয়েছে মানে? কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছ—পরিষ্কার চিৎকার শুনেছি আমরা।"

"আসলে সেটা সত্যি সত্যি চিৎকার না—এমনি এমনি—"

কালোমতন একজন পুলিশ চিৎকার করে বলল, "আবার কথা বলে? কতো বড়ো সাহস? নাম গাড়ি থেকে।"

মোটামতন একজন পুলিশ বলল, "এত কথার দরকার কী? মাথার মাঝে গুলি করে দাও। সোজা ক্রসফায়ার।"

শুকনোমতন একজন পুলিশ বলল, "কলার ধরে নামাও। নামিয়ে প্রথমে আচ্ছা মতো বানাও।"

মানিক আর রতন বুঝতে পারল অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এখন গাড়ি থেকে নেমে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। দুইজন তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নামল। তখন পুলিশ তাদের টেনে গাড়ির পাশে দাঁড়া করিয়ে দিল। পিঠের মাঝে রাইফেল ঠেকিয়ে কালোমতন পুলিশ হুংকার দিয়ে বলল, "তোরা কারা? ডাকাত, সন্ত্রাসী নাকি কিডন্যাপার?"

মানিক বলল, "আমরা মোটেও ডাকাত সন্ত্রাসী কিডন্যাপার এরকম কেউ না। আমি একজন কবি, লেখালেখি করি। ইনি হচ্ছেন বৈজ্ঞানিক!"

মোটামতন পুলিশ হা হা করে হাসল। বলল, "আমাদের সঙ্গে মশকরা। তোরা কবি? তোরা বৈজ্ঞানিক? চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে তোরা হচ্ছিস ক্রিমিনাল। তোদের চেহারার মাঝে ক্রিমিনালের ছাপ।"

মানিক বলল, "দেখেন, আপনাদের সাথে একটা ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। আমরা মোটেও ক্রিমিনাল না। আপনারা চাইলে প্রমাণ করে দিতে পারব।"

শুকনোমতন পুলিশ বলল, "কথা পরে। আগে আচ্ছামতন একবার বানাই।"

মোটামতন পুলিশ শুকনোমতন পুলিশকে ধমক দিয়ে বলল, "তোমার শুধু বানানো আর বানানো! বানানোর সময় কি চলে গেছে? রাস্তার পাশে

মারধোর করলে কোনো একজন সাংবাদিক ছবি তুলে পত্রিকায় ছাপিয়ে দিলে উপায় আছে?"

কালোমতন পুলিশ, "আগে বিজনেস। তারপরে অন্য কথা।"

মোটামতন পুলিশ বলল, "হ্যাঁ আগে বিজনেস।" তারপর মানিক আর রতনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোরা এখন বল কত টাকা দিবি?"

রতন অবাক হয়ে বলল, "টাকা? টাকা কেন দেব?"

মোটামতন পুলিশ হা হা করে হাসল, বলল, "টাকা কেন দিবি জানিস না? টাকা না দিলে তোদের নামে মামলা করে হাজতে পাঠিয়ে দেব! বাকি জীবন জেলখানায় থাকবি।"

"মামলা?" রতন বলল, "আমাদের নামে কী মামলা করবেন?"

"ব্যাংক ডাকাতি।"

রতন হেসে ফেলল, "আমাদের নামে ব্যাংক ডাকাতির মামলা কেউ বিশ্বাস করবে না!"

কালোমতন পুলিশ হুংকার দিয়ে বলল, "বিশ্বাস করবে না? হাতে নাতে ব্যাংক ডাকাতকে ধরলে কেউ বিশ্বাস করবে না!"

"আমাদেরকে হাতে নাতে ধরেছেন?"

"অবশ্যই, হাতে নাতে ধরেছি। তোদের গাড়ির ভেতর থাকবে অস্ত্র আর টাকা! ব্যাংক থেকে যে টাকা ডাকাতি করে এনেছিস, সেই টাকা তোদের গাড়ি থেকে উদ্ধার করা হবে।"

"আমাদের গাড়িতে কোনো টাকা নেই।"

"দেখতে চাস টাকা আছে কি নেই?"

রতন কোনো কথা না বলে কালোমতন পুলিশটির দিকে তাকিয়ে রইল। পুলিশটি গলা উঁচিয়ে বলল, "গাড়ির ভিতরে পলিথিনের ব্যাগে দুই লাখ টাকা আছে না?"

শুকনোমতন পুলিশটা বলল, "আছে।"

"এই গাড়ির ভেতরে রাখ।"

রতন চিৎকার করে বলল, "আপনি এটা করতে পারেন না। কিছুতেই করতে পারেন না।"

মোটামতন পুলিশ বলল, "দেখা যাক সেটা করা যায় কি না!" তারপর আনন্দে হা হা করে হাসল।

মানিক আর রতন বিস্ফারিত চোখে দেখল তাদের গাড়িতে সিটের নীচে পলিথিনের ব্যাগে করে অনেকগুলো টাকা ঠেসে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। তারপর একটা জংধরা রিভলবার আর একটা বড়ো চাকু ড্যাশবোর্ডের ভিতর ঢুকিয়ে রাখল। মোটা পুলিশটা বলল, "কাজ কমপ্লিট।"

চিকন পুলিশটা বলল, "এখন বানাই?"

"এখনই না।"

কালোমতন পুলিশ বলল, "এখন স্যারকে খবর দেই। স্যার আসার পর স্যারের সামনে গাড়ি তল্লাশি করে টাকা আর অস্ত্র বের করব। তাহলে আর কেউ সন্দেহ করবে না।"

মোটামতন পুলিশ আনন্দে আবার হা হা করে হাসল। মানিক দুর্বল গলায় বলল, "দেখেন, কাজটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। আমরা একেবারেই নিরপরাধী মানুষ, কিছুই করি নাই। আমাদেরকে এরকম একটা বিপদের মাঝে ফেলে দেয়া কি ঠিক হচ্ছে?"

শুকনোমতন পুলিশটা বলল, "বিপদের তোরা দেখেছিস কী?" মাত্র তো শুরু হলো! আগে হাজতে নিয়ে যাই তারপরে দেখবি বিপদ কত প্রকার ও কী কী!"

কালোমতন পুলিশ তখন ওয়াকিটকি বের করে কথা বলতে শুরু করেছে। মানিক আর রতন শুনল সে বলছে, "জী স্যার, দুইজন ব্যাংক ডাকাতকে ধরেছি। ব্যাংক থেকে খবর দিয়েছিল। গাড়িটা কেমন বলেছে আর চেহারার বর্ণনা দিয়েছে। আমরা রাস্তায় বেরিকেড দিয়ে ধরে ফেলেছি। গাড়িটা এখনো সার্চ করি নাই। আপনি আসার পর আপনার সামনে সার্চ করব।... না স্যার... চেহারা দেখে বোঝাই যায় না ব্যাংক ডাকাত। ভদ্রলোকের মতো চেহারা। কী যে হয়েছে দেশটার বুঝি না, স্যার। মানুষের মাঝে সততা নাই। ঠিক আছে স্যার আমরা অপেক্ষা করছি।"

পুলিশ তিনজন মানিকের ডান হাত আর রতনের বাম হাতের মাঝে একজোড়া হাতকড়া লাগিয়ে তাদেরকে রাস্তার পাশে একটা গাছের নীচে

বসিয়ে রাখল। মানিক বিস্ফারিত চোখে হাতে লাগানো হাতকড়াটির দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় বলল, "কী বিপদে পড়েছি দেখেছেন! এখন কী হবে!"

"কুংফু।"

মানিক অবাক হয়ে বলল, "কী বললেন?"

"বলেছি কুংফু।"

"কুংফু? কুংফু কেন বলছেন?"

"হ্যাঁ। আপনি ঘুংচুর প্রতিশব্দ চাচ্ছিলেন, কুংফু কি হতে পারে?"

মানিক মুখ শক্ত করে বলল, "এরকম সময় আপনি ঠাট্টা করতে পারেন? আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আপনি জানেন আমরা কী বিপদে পড়েছি?"

রতন খোলা হাত দিয়ে তার পকেট থেকে টেলিভিশনের রিমোট কন্ট্রোলের মতো একটা জিনিস বের করে বলল, "আমরা বেশি বিপদে পড়েছি নাকি এই পুলিশগুলো বেশি বিপদে পড়েছে দেখা যাক।"

"পুলিশগুলো কেন বেশি বিপদে পড়বে?"

রতন রিমোট কন্ট্রোলের মতো জিনিসটা মানিককে দেখিয়ে বলল, "এটা হচ্ছে আমার গাড়িটির রিমোট কন্ট্রোল। দুইটা মোডে কাজ করে, নরমাল আর কুংফু।"

"কুংফু?"

"হ্যাঁ। কুংফু মোডে আগে টেস্ট করি নাই। দেখি কেমন কাজ করে।" বলে রতন রিমোট কন্ট্রোলারে একটা বেতাম টিপে ধরতেই গাড়িটা হঠাৎ যেন কেমন গা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল, তারপর নিঃশব্দে পুলিশগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। পুলিশ তিনজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিলেন, প্রথমে লক্ষ করেনি হঠাৎ শুকনোমতন পুলিশটা গাড়িটাকে দেখতে পায়, সে চিৎকার করে উটলে, "ইয়া মাবুদ।" গাড়িটা তখন হঠাৎ তাদের দিকে ছুটে গেল এবং কাছাকাছি যেতেই গাড়ির দরজা খুলে যায় আর দরজার সাথে ধাক্কা খেয়ে কালোমতন পুলিশটা রাস্তার উপর ছিটকে পড়ল।

মোটামতন পুলিশটা চিৎকার করে সরে গেল, গাড়িটা তখন হঠাৎ থেমে যায় এবং দরজা দুটি আবার ঝপঝপ করে বন্ধ হয়ে গেল। মানিক অবাক হয়ে দেখল গাড়িটা নিঃশব্দে পিছিয়ে যাচ্ছে, দেখে স্পষ্ট বোঝা

যাচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে সেটা আবার পুলিশগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। হলোও তাই—হঠাৎ করে গাড়িটা পুলিশ তিনজনের দিকে ছুটে এল আর পুলিশ তিনজন "ও বাবাগো ও মাগো" বলে চিৎকার করে ছুটতে থাকে। মোটামতন পুলিশটা রাস্তায় আছাড় খেয়ে পড়ল আর গাড়িটা কাছাকাছি গিয়ে পিছনের দুই চাকার উপর ভর করে সামনের দুই চাকা উপরে তুলে দাঁড়িয়ে গেল।

মোটা পুলিশটা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কোনোমতে সরে যায়, গাড়িটাও ঝপাং করে চাকা নামিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আবার নিঃশব্দে পিছনে সরতে থাকে। দেখেই বোঝা যায় গাড়িটা আবার পুলিশ তিনজনকে আক্রমণ করার পাঁয়তারা করছে। পুলিশ তিনজন এবারে একজন আরেকজনের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকায়। তারপর একজন আরেকজনকে ধরে আতঙ্কিত মুখে তাকিয়ে থাকে। মানিক অবাক হয়ে দেখল, গাড়িটা কেমন জানি একবার গা-ঝাড়া দিল, তারপর একবার পিছনের চাকা দুটো উপরে তুলে ছোটো একটা লাফ দিল। তারপর সামনের চাকা দুটো উপরে তুলে পুলিশগুলোকে ধাওয়া করল। পুলিশ তিনজন চিৎকার করতে করতে ছুটতে থাকে, মানিক আর রতন দেখতে পেল তারা রাস্তা থেকে লাফিয়ে পাশের খেতে নেমে পড়ে তারপর ছুটতে ছুটতে ঝপাং ঝপাং করে একটা ডোবায় লাফিয়ে পড়ল।

ঠিক তখন বহুদূর থেকে একটা সাইরেনের শব্দ শোনা যায়। মানিক আর রতন তাকিয়ে দূর থেকে পুলিশের গাড়ির লাল নীল বাতি জ্বলতে আর নিভতে নিভতে এগিয়ে আসতে দেখতে পায়।

রতন মানিকের দিকে তাকিয়ে বলল, "এখন গাড়িটাকে কুংফু মোড থেকে নরমাল মোডে নিয়ে যাই। কী বল?"

"হ্যাঁ। নিয়ে যাও।"

মানিক আর রতন যে একজন আরেকজনকে তুমি করে বলতে শুরু করেছে সেটা তারা দুজনের কেউই লক্ষ করল না।

রতন বলল, "গাড়িটাকে কাছাকাছি রাখা ঠিক হবে না। দূরে পাঠিয়ে দিই, সেখানে অপেক্ষা করুক।"

মানিক বলল, "হ্যাঁ, দূরে পাঠিয়ে দাও।"

রতন তার রিমোট কন্ট্রোলের কোথায় যানি চেপে ধরল, সাথে সাথে গাড়িটা গর্জন করে ধোঁয়া ছেড়ে সামনের দিকে ছুটে যেতে লাগল, কিছুক্ষণের মাঝেই চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অন্যদিক থেকে তখন পুলিশের গাড়িটা লাল নীল আলো জ্বালাতে জ্বালাতে এবং নিভাতে নিভাতে সাইরেন বাজিয়ে চলে আসতে থাকে। গাড়িটা চলে গেছে দেখে পুলিশ তিনজন ডোবা থেকে উঠে মাঠ ধরে হেঁটে আসতে থাকে। ভিজে চুপচুপে, সারা শরীরে কাদা। মোটা পুলিশটার মাথায় কিছু কচুরিপানা, কালো পুলিশের গলায় একটা জোঁক।

পুলিশের গাড়িটার দিকে চোখ রেখে রতন মানিককে জিজ্ঞেস করল, "এখানে কী হয়েছে তুমি কি সেটা সম্পর্কে কিছু জানো?"

মানিক মাথা নাড়ল, বলল, "জানি না।"

"কুংফু গাড়ি?"

"কুংফু গাড়ি? সেটা আবার কী? আমি কিচ্ছু জানি না।"

রতন মানিকের দিকে চোখ টিপে বলল, "আমিও জানি না!"

ঠিক এ রকম সময় তাদের সামনে একটা পুলিশের গাড়ি থামে—সেখান থেকে একজন পুলিশ অফিসার নেমে এদিক সেদিক তাকিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসে। তাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমার পুলিশ ফোর্স কই?"

মানিক খোলা হাতটি দিয়ে মাঠের দিকে দেখাল, বলল, "ঐ যে আসছে।" পুলিশ অফিসার সেদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল, মাটি কাদা মেখে ভিজে জবুথবু হয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে তিনজন আসছে। পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে বললেন, "এ কী অবস্থা তোমাদের? কী হয়েছে?"

কালোমতন পুলিশটা বলল, "আপনি বিশ্বাস করবেন না স্যার। গাড়িটা নিজে থেকে আমাদের ধাওয়া করল—"

"কে তোমাদের ধাওয়া করল?"

"গাড়ি স্যার।"

"গাড়িতে কে ছিল?"

"কেউ না স্যার। খালি গাড়ি।"

পুলিশ অফিসার ভুরু কুঁচকে তাদের তিনজনের দিকে তাকিয়ে রইল,

তারপর মেঘস্বরে বলল, "ঠিক করে বল কী হয়েছে?"

"সত্যি কথা বলছি স্যার। খোদার কসম—"

পুলিশ অফিসার ধমক দিয়ে বলল, "খবরদার, মুখে আল্লাহ খোদার নাম নিবে না। কী হয়েছে বল।"

"সত্যি কথা বলছি স্যার। আমার কথা বিশ্বাস না হলে ওদের জিজ্ঞেস করেন।"

মোটা পুলিশ হড়বড় করে বলল, "সত্যি কথা স্যার। পুরোপুরি সত্যি। গাড়িটা এসে দরজাটা খুলে ওরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে আমার দিকে ছুটে আসতে শুরু করল। কাছে এসে পিছনের দুই পায়ের উপর দাঁড়িয়ে সামনের দুই পা—"

"পা? গাড়ির পা ছিল?"

"মানে চাকা স্যার। এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল যে মনে হলো চাকা না পায়ের ওপর দাঁড়িয়েছে। আরেকটু হলে জানে মেরে ফেলেছিল, কোনোমতে পালিয়ে রক্ষা পেয়েছি।"

"সেই গাড়ি কোথায়?"

"নিজে নিজে চলে গেল।"

"নিজে নিজে চলে গেল মানে?" পুলিশ অফিসার ধমক দিয়ে বলল, "গাড়ি নিজে নিজে চলে যায় শুনেছ কখনো? শুনেছ?"

"কিন্তু স্যার গিয়েছে। ওদের জিজ্ঞেস করেন।"

শুকনো পুলিশটা বলল, "জি স্যার গিয়েছে। সত্যি কথা স্যার।"

"তুমি বলবে আর আমি বিশ্বাস করব?"

মানিক একটু গলা খাঁকাড়ি দিয়ে বলল, "আমি বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করি?"

"আপনি?"

"জি, আমি। এই তিনজন আমাদের দুইজনকে ধরে ব্যাংক ডাকাতির মামলা দেবেন বলে হুমকি দিচ্ছেন।"

"এবং টর্চার করবে—" রতন মনে করিয়ে দিল।

মানিক মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। এবং টর্চার করার ভয় দেখাচ্ছে। শব্দটা অবশ্যি টর্চার ব্যবহার করেনি, ওরা বলেছে, বানাবে।"

শুকনো পুলিশটা দুর্বল গলায় বলল, "বলি নাই। আমি—"

পুলিশ অফিসার তাকে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে বলল, "তুমি চুপ কর।"

শুকনো পুলিশটা চুপ করে গেল। মানিক আবার শুরু করল, "যাই হোক, আমাদের হাতকড়া লাগিয়ে এখানে দাঁড়া করিয়ে কার সাথে জানি কথা বলল—"

"আমার সাথে।"

"তারপর ঐখানে দাঁড়িয়ে কিছু-একটা খেলো—"

মোটামতন পুলিশটা বলল, "খাই নাই।"

"সিগারেটের মতো কিন্তু সিগারেট না ড্রাগ বোঝা গেল না। খাওয়ার পরই তিনজনই কেমন জানি অন্যরকম হয়ে গেল। এক ধরনের হেলুসিনেশান বলতে পারেন। অদৃশ্য কিছু-একটা দেখিয়ে চিৎকার করে বলে, গাড়ি আসছে! বাঁচাও বাঁচাও! লাফ দেয়, দৌড়ায়, চিৎকার করে। তারপর দেখলাম চিৎকার করতে করতে পানিতে লাফিয়ে পড়ল। তখন মনে হলো তিনজনই একটু শান্ত হলো।"

পুলিশ অফিসার সরু চোখে তাকিয়ে বলল, "ও! তাহলে এই ব্যাপার। ডিউটিতে ড্রাগস খাওয়া হচ্ছে?"

কালোমতন পুলিশটা বলল, "বিশ্বাস করেন স্যার, কিছু খাই নাই। আল্লাহর কসম!"

"কিছু না খেলে কেউ কখনো গাড়িকে লাফাতে দেখে? গাড়িকে দুই চাকার উপর দাঁড়িয়ে নাচানাচি করতে দেখে? দেখে?"

পুলিশ তিনটি কী করবে বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। পুলিশ অফিসার অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "কী লজ্জা! কী লজ্জা! তোমাদের মতো মানুষের জন্যে আমাদের এত বদনাম। ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!"

পুলিশ অফিসার এবারে মানিক আর রতনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি খুবই দুঃখিত, আপনাদের মিছিমিছি হয়রানি করার জন্যে। ক্ষমা চাচ্ছি আপনাদের কাছে।"

রতন হাতকড়াটা দেখিয়ে বলল, "এবারে তাহলে এটা খুলে দেন। খুব চুলকাচ্ছে হাত।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ খুলে দিচ্ছি। চাবিটা কার কাছে?"

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের হাত থেকে হাতকড়া খুলে দেয়া হলো। পুলিশ অফিসার অনেকবার ক্ষমা চাইলেন, পুরো ব্যাপারটা ভুলে যেতে বললেন, মানিক আর রতন বলল তারা চেষ্টা করবে ভুলে যেতে।

কালোমতন, মোটামতন এবং শুকনোমতন পুলিশকে গাড়ির পিছনে তোলা হলো, তাদেরকে নিয়ে এখন ডাক্তারি পরীক্ষা করা হবে। মানিক আর রতন লক্ষ করল তারা বিড়বিড় করে বলেছে, "একেবারে স্পষ্ট দেখেছি আমরা—বিশ্বাস করেন! কী আজিব ব্যাপার! বাপের জন্মে এরকম দেখি নাই—"

পুলিশের দলটি সবাইকে নিয়ে চলে যাবার পর মানিক আর রতন একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে প্রথমে আস্তে আস্তে তারপর জোরে জোরে হাসতে শুরু করে। হাসতে হাসতে হঠাৎ করে মানিক থেমে গেল, বলল, "একটা জিনিস লক্ষ করেছ?"

"কী?"

"তোমার নামটাই এখনো জানা হয়নি! আমার নাম মানিক। আজিজ মার্কেটে গিয়ে যে কাউকে যদি জিজ্ঞেস করো কবি মানিক কোথায়, সাথে সাথে তারা আমাকে খুঁজে বের করে দিবে। তোমার নাম?"

রতন বলতে শুরু করল, "আমার নাম—"

মানিক হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বলর, "দাঁড়াও! দাঁড়াও! আগেই বলে দিও না। আমি অনুমান করার চেষ্টা করি। তোমার নাম হচ্ছে বিজ্ঞানী অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ অনুরণন—"

রতন মাথা নাড়ল, বলল, "না। আমার নাম রতন।"

এইভাবে মানিক আর রতনের পরিচয় হলো।

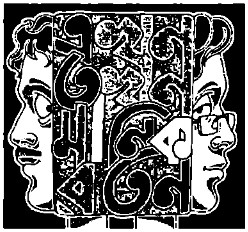

ডুগুডুগু

রতনের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে মানিক দরজায় টোকা দেবার আগেই খুট করে দরজাটা খুলে গেল, দরজার ওপাশে রতন দাঁড়িয়ে আছে। মানিক অবাক হয়ে বলল, "কী হলো? দরজায় টোকা দেবার আগেই দরজা খুলে দিলে?"

"হুঁ দিয়েছি।"

"নিশ্চয়ই টেলিপ্যাথি। তুমি টেলিপ্যাথি করে বুঝে গেছ আমি এসেছি। ঠিক কি না?"

"উঁহু।" রতন মুখ শক্ত করে বলল, "আমি ক্লোজসার্কিট টিভিতে দেখেছি তুমি আসছ।"

মানিকের একটু মন খারাপ হলো, বলল, "ইশ! যদি টেলিপ্যাথি হতো তাহলে কী মজা হতো তাই না? তুমি একটু গবেষণা করে টেলিপ্যাথি যোগাযোগ করতে পার না?"

"মোবাইল টেলিফোন টেলিপ্যাথি থেকে অনেক ভালো কাজ করে। অনেক সস্তাও।"

মানিক হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, "নাহ্! তোমার মাঝে কোনো কোমল ব্যাপার নেই। তোমার সবকিছু হচ্ছে কাঠখোট্টা।"

রতন একটু সরে মানিককে ঘরের ভেতরে ঢুকতে দিয়ে বলল, "এটা মোটেও সত্যি না। আমার সবকিছু যদি কাঠখোট্টা হতো তাহলে আজকে তোমাকে আমি বাসাতে ঢুকতেই দিতাম না।"

মানিক অবাক হয়ে বলল, "সে কী! আমাকে কেন বাসায় ঢুকতে দেবে না?"

রতন মুখ শক্ত করে বলল, "এখন কয়টা বাজে?"

মানিক তার ঘড়ি দেখে বলল, "এগারোটা।"

"তোমার সকাল আটটার সময় আসার কথা ছিল, আজকে আমাদের সাভারে সাপের বাজারে যাবার কথা। তুমি এসেছ তিন ঘণ্টা পরে। এগারোটায়।"

মানিক এমনভাবে রতনের দিকে তাকিয়ে রইল যে তাকে দেখে মনে হলো সে রতনের কথা বুঝতে পারছে না। একটু ইতস্তত করে বলল, "আটটা আর এগারোটার মাঝে পার্থক্য কী? একই তো কথা।"

"একই কথা?" রতন চোখ কপালে তুলে বলল, "একই কথা?"

"হ্যাঁ একই কথা। সময় নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কী আছে? আমরা সময়কে ব্যবহার করব, নাকি সময় আমাদের ব্যবহার করবে?"

"মানে?"

"কে বলেছে আমাদের ঘড়ি ধরে চলতে হবে? আমি আমার জীবনকে ঘড়ি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে দেব না। কক্ষনো না। আমার যখন ইচ্ছে ঘুমাব যখন ইচ্ছা ঘুম থেকে উঠব।"

রতন বলল, "ঠিক আছে। তাহলে তুমি কেন কালকে বললে আজ সকাল আটটায় আসবে? আমি আটটা থেকে অপেক্ষা করছি। তোমাকে ফোন করেছি তুমি ফোন ধরো না—"

মানিক মুখ গম্ভীর করে বলল, "শুধু ঘড়ি না আমি মোবাইল ফোনকেও আমার জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে দেব না। কক্ষনো না।"

"খুব ভালো কথা। তাহলে তুমি কেন আমাকে তোমার মোবাইল টেলিফোন নম্বর দিয়ে বললে, সকালে ফোন করো। ঘুম থেকে তুলে দিও। আমি ফোন করেছি—"

"ও!" মানিকের চোখ মুখ হঠাৎ ঝলমল করে উঠে, "এখন বুঝতে পেরেছি! কী সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছিলাম সাদা রাজহাঁস পানিতে ভাসছে ঠিক তখন টেলিফোন দিল ঘুমটা ভাঙিয়ে তার মানে সেটা ছিল তোমার টেলিফোন! তুমি ফোন করে আমার ঘুম ভাঙিয়েছ?"

"আমি মোটেই তোমার ঘুম ভাঙাতে পারি নাই। তাহলে তুমি এগারোটার সময় আসতে না।"

"ঘুমটা ভেঙেছিল কিন্তু আমি টেলিফোনটা বন্ধ করে আবার ঘুমিয়ে গেলাম। স্বপ্নে রাজহাঁসগুলো আর পেলাম না, এবারে শুধু পাতিহাঁস।"

রতন হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, "তোমার টেলিফোন বন্ধ করার কথা না। তোমার উঠে বসার কথা, ঘুম থেকে জেগে ওঠার কথা। সত্যি কথা বলতে কী, এলার্ম দিয়ে তোমার নিজেরই ঘুম থেকে ওঠার কথা।"

মানিক মুখ শক্ত করে বলল, "আমি এলার্ম ক্লককে আমার জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে দেব না। কক্ষনো না।"

"তুমি কখনো এলার্ম ক্লক দিয়ে ঘুম থেকে ওঠার চেষ্টা করেছ?"

"অবশ্যই করেছি। আমি প্রত্যেক রাতে ঘুমানোর সময় আমার এলার্ম ক্লকটা সেট করি। সকাল সাতটার জন্যে।"

"তারপর?"

"সকাল সাতটায় এলার্ম বাজে—আমি তখন ঘুমের মাঝে এলার্মটা বন্ধ করে আবার ঘুমিয়ে যাই। পৃথিবীর কোনো এলার্ম ক্লক আমাকে কখনো ঘুম থেকে তুলতে পারেনি।"

রতন সরু চোখে মানিকের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কি এমন কোনো এলার্ম ক্লক চাও যেটা তোমাকে ঘুম থেকে তুলে দিতে পারবে?"

"না চাই না।"

রতন মাথা নেড়ে বলল, "আমি সেটাই ভেবেছিলাম।"

"কী ভেবেছিলে?"

"তুমি এলার্ম ক্লকটা ব্যবহার করো যেন সেটা তোমার ঘুমটা একটু ভাঙানোর চেষ্টা করে আর তখন সেটাকে বন্ধ করে তুমি আরো জোরেসোরে পাগলের মতো ঘুমাও।"

মানিকের মুখটা আনন্দে ঝলমল করে উঠল, মাথা নেড়ে বলল, "তুমি একেবারে ঠিক ধরেছ! আমি যখন একটা যন্ত্রকে অপমান করি তখন আমার এক ধরনের আনন্দ হয়!"

"অপমান?"

"হ্যাঁ।"

"যন্ত্রকে অপমান করা যায় সেটা আমি এই প্রথম তোমার কাছে শুনলাম।"

মানিক গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল, বলল, "করা যায়। তুমি যদি চাও আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব।"

রতন বলল, "আমি শিখতে চাই না।"

"না চাইলেও শিখিয়ে দিতে পারি।" মানিক উদারভাবে হেসে বলল, "যন্ত্রকে অপমান করতে হয় তাকে গুরুত্ব না দিয়ে। যে যন্ত্রের যে কাজ সেটা না করিয়ে সেটা দিয়ে অন্য অসম্মানজনক কাজ করিয়ে।"

"অসম্মানজনক কাজ?"

"হ্যাঁ। যেমন মোবাইল টেলিফোন আমি ব্যবহার করি দেওয়ালে পেরেক ঠোকার জন্যে।"

রতন চোখ বড়ো বড়ো করে তাকাল, কিছু-একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, শেষ পর্যন্ত বলল না। মানিক পকেট থেকে তার টেলিফোনটা বের করে দেখিয়ে বলল, "এই দেখ একটু ফেটেফুটে গেছে। অপমানের চূড়ান্ত।"

"আর কী কর?"

"যেমন মনে করো টেলিভিশন। সেটা আমার বিছানার পিছনে কাত করে রেখেছি।"

"কাত করে রেখেছ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"আমি যখন কাত হয়ে শুয়ে থাকি তখন যেন দেখতে পারি।"

"যখন সোজা হয়ে বসে থাক কিংবা দাঁড়িয়ে থাক?"

"তখন টেলিভিশনের উপর আমি আমার জুতো মোজা রাখি। চূড়ান্ত অপমান।"

রতন মাথা নাড়ল, বলল, "টেলিভিশনের বোঝার ক্ষমতা থাকলে তার কাছে এটা চূড়ান্ত অপমান মনে হতে পারত। তুমি ঠিকই বলেছ।"

মানিক উৎসাহ পেয়ে বলল, "তারপর মনে করো ফ্রিজ। ফ্রিজকে আমি ব্যবহার করি ঘর ঠান্ডা করার জন্যে। যখন গরম পড়ে তখন আমি ফ্রিজের দরজা খোলা রাখি।"

রতন মাথা নেড়ে বলল, "এভাবে কখনো ঘর ঠান্ডা হয় না।"

"না হলে নাই, কিন্তু ফ্রিজের অপমান তো হয়। ফ্রিজের মাঝে আমি ময়লা কাপড় রাখি—সেইটাও অপমান।"

রতন মাথা নাড়ল। মানিক বলল, "তারপর মনে করো ইলেকট্রিক ইস্ত্রি। আমি সেটা দিয়ে রুটি টোস্ট করি।"

"রুটি টোস্ট কর?"

"হ্যাঁ। একটা পাউরুটির স্লাইস প্লেটে রেখে তারপর উপর গরম ইস্ত্রি চেপে ধরি। রুটিটা তখন টোস্ট হয়। ইস্ত্রিটাকে তখন আমি অপমানসূচক কথা বলি।"

"তুমি ইস্ত্রির সাথে কথা বল?"

"হ্যাঁ। অপমানসূচক কথা।"

"কী রকম কথা?"

মানিক মুখ সুচালো করে বলল, "যেমন আমি বলি, ধিক ইস্ত্রি ধিক। ধিক তোমার এই অর্থহীন জীবন। তুমি ধ্বংস হও, তোমার কানেকশান ছুটে তুমি জঞ্জালে পরিণত হও আমি তোমাকে সেই অভিশাপ দিই—"

রতন বলল, "কানেকশান ছুটে তোমার ইস্ত্রি জঞ্জালে পরিণত হলে তোমার আরেকটা ইস্ত্রি কিনে আনতে হবে, তোমার টাকা পয়সা নষ্ট হবে, তারপরেও তুমি এই অভিশাপ দাও?"

"হ্যাঁ। দিই।" মানিক হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি কোনো যন্ত্রকে আমার জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে দেব না।"

"তুমি আর কোন কোন যন্ত্রকে অপমান কর?"

"সব যন্ত্রকে। যখন আলোর দরকার হয় তখন আমি একটা একটা লাইট নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে মোমবাতি জ্বালাই। মোমবাতির আলোতে কাজ করি আর ইলেকট্রিক লাইটগুলোকে হালকা গালাগাল করি।"

"তাতে লাইটগুলোর অপমান হয়?"

"না। পুরোপুরি অপমান হয় না। তাই যখন দিনের বেলা অনেক আলো থাকে তখন সব লাইট জ্বালিয়ে দিয়ে তাদেরকে অপমানসূচক কথা বলি।"

"কী রকম অপমানসূচক কথা বল?"

যেমন আমি বলি, "এই যে ইলেকট্রিক লাইট, তুমি কি দেখছ এখন চারিদিকে কী চমৎকার সূর্যের আলো? এই চমৎকার সূর্যের আলোতে তোমার কি নিজেকে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছে না? তোমার আলো কতো ক্ষুদ্র কতো তুচ্ছ কতো নগণ্য দেখেছ? এইরকম কথা।"

রতন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তোমার বাসায় কম্পিউটার আছে?"

মানিক মাথা নাড়ল, বলল, "না নাই। আমি কম্পিউটারকে ঘৃণা করি।"

রতন চোখ কপালে তুলে বলল, "ঘৃণা? তুমি বলছ ঘৃণা?"

"হ্যাঁ। যন্ত্রদের মাঝে সবচেয়ে বড়ো ক্রিমিনাল হচ্ছে কম্পিউটার।"

"ক্রিমিনাল?"

"হ্যাঁ। এটা যন্ত্র হয়েও এমন ভান করে যে এটা যন্ত্র না। এটা কীসের যন্ত্র সেটা নিয়েও সবাইকে ফাঁকি দেয়। কেউ বলে গান শোনার যন্ত্র, কেউ বলে সিনেমা দেখার কেউ বলে হিসাব করার, কেউ বলে চিঠি লেখার। এরকম কেন হবে? আগে ঠিক করে নিক এটা কীসের যন্ত্র তারপর আমি এটা স্পর্শ করব। তাছাড়া—"

"তাছাড়া কী?"

"তাছাড়া আমি নেতিবাচক নামের জিনিস পছন্দ করি না।"

"নেতিবাচক?"

"হ্যাঁ। নাম হচ্ছে কম্পিউটার। কম কেন? কোন জিনিসটা কম? যখন তৈরি হবে বেশি-পিউটার তখন দেখা যাবে।"

রতন বলল, "মানিক, তুমি মনে হয় একটা জিনিস বুঝতে পারছ না। এর নামটা এসেছে—"

মানিক রতনকে কথা শেষ করতে দিল না, বলল, "তোমাকে যদি বলা হয় কমবুদ্ধির একটা মেয়েকে বিয়ে করতে হবে, তুমি কি রাজি হবে? হবে

না। তুমি চাইবে বেশি বুদ্ধির একটা মেয়ে। ঠিক সেইরকম কেন আমি কম-পিউটারে রাজি হব? আমার দরকার বেশি-পিউটার।"

রতন হাল ছেড়ে দিল, মানিক ছাড়ল না, সে কথা বলে যেতেই লাগল। শেষপর্যন্ত যখন ক্লান্ত হয়ে একটু থামল তখন রতন জিজ্ঞেস করল, "এই যে তুমি যন্ত্রপাতিকে ঘৃণা কর, তাদের অপমান কর এর জন্যে তোমার কখনো কোনো সমস্যা হয় নাই?"

"হলে হয়েছে, কিন্তু সে জন্যে আমি আমার নীতিকে বিসর্জন দেইনি।"

"কী সমস্যা হয়েছে?"

"এই তো—" বলে মানিক হাত নেড়ে বিষয়টা শেষ করে দেবার চেষ্টা করল।

রতন অবশ্যি সেটা মেনে নিল না, বলল, "তুমি শুধু তোমার দিকটা বলে যাবে—যন্ত্রকে তুমি কীভাবে অপমান করেছ তা হবে না। যন্ত্রকে অপমান করার জন্যে যন্ত্র তোমাকে কী শাস্তি দিয়েছে সেটাও বলতে হবে।"

"সেটা এমন কিছু না।"

"তবুও শুনি।"

মানিক ইতস্তত করে বলল, "যেমন ধর থার্মোমিটারের ব্যাপারটা। মানুষের শরীরে হাত দিলেই বোঝা যায় জ্বর আছে কি নেই—খামোখা থার্মোমিটার নামে একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে। তাই থার্মোমিটারকে অপমান করার জন্যে আমি সেটাকে—" মানিক কথা থামিয়ে থেমে গেল।

"কী হলো, থামলে কেন বল। কী করতে থার্মোমিটার দিয়ে?"

মানিক ইতস্তত করে বলল, "কান চুলকাতাম।"

রতন চমকে উঠে বলল, "সর্বনাশ! কানের ভিতর থার্মোমিটার ভেঙে গেলে কেলেংকারি হয়ে যাবে। থার্মোমিটারে থাকে পারদ, ভেঙে কানের ভিতর ঢুকে গেলে—"

মানিক ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "হ্যাঁ। ডাক্তার খুব রাগ করেছিল—"

"তার মানে সত্যি সত্যি তোমার কানের ভিতর থার্মোমিটার ভেঙে গিয়েছিল? কী সর্বনাশ!"

মানিক আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আগের দিনে ডাক্তাররা খুবই হৃদয়বান মানুষ ছিল। আজকালকার ডাক্তারেরা হৃদয়হীন এবং আবেগ বিবর্জিত।"

রতন মাথা নেড়ে বলল, "ডাক্তার কি তোমাকে কিল ঘুষি দিয়েছিল?"

"না। কিন্তু যে ভাষায় আমার সাথে কথা বলেছে সেটা কোনো সভ্য মানুষের উপযোগী ভাষা না। অমার্জিত বর্বর মানুষের ভাষা—"

"তোমার কপাল ভালো আমি ডাক্তার না, আর কানের ভিতর থার্মোমিটার ভেঙে তুমি আমার কাছে আস নাই। আমি হলে নির্ঘাত তোমাকে দুই এক ঘা লাগাতাম।"

মানিক খুব অল্প সময়ের মাঝে তার তিন নম্বর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোমরা—বিজ্ঞানের মানুষেরা হৃদয়হীন। কাঠখোট্টা বিজ্ঞান তোমাদের সমস্ত আবেগ সমস্ত কোমল অনুভূতি শুষে নিয়েছে। আমি একজন কবি মানুষ, সুন্দরের পূজারী, আমার সাথে এই ভাষায় কথা বলা যায় না। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর—"

"তোমাকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমি সেটা নিয়ে কথা বলতে চাই না। যখন একজন মানুষ কানে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে শুয়ে থাকে তখন যদি দূরদূরান্ত থেকে মেডিকেল স্টুডেন্টরা তাকে দেখতে আসে এবং তখন যদি তাকে কানের ভেতর থার্মোমিটার ভাঙা পাগল হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়, সেটা খুবই হৃদয়বিদারক। আমি সেই সব মুহূর্তের কথা মনে করতে চাই না। কমবয়সি সুন্দরী মেডিকেল স্টুডেন্টদের খিলখিল হাসির কথা আমি স্মরণ করতে চাই না।"

রতন খুব ভালো করে জানে কেউ কোনো কিছু স্মরণ করতে না চাইলেই যে সেটা তার স্মরণ হবে না এটা সত্যি নয় তাই মানিকের সবকিছু স্মরণ হতে লাগল। তার মুখচোখে একটা গভীর দুঃখের ছায়া পড়ল। রতনের মানিকের জন্যে একটু মায়া হলো, তাই বলল, "খামোখা ওই সব কথা মনে করে লাভ নেই—"

মানিক বলল, "তুমি চিন্তা করতে পারবে না। কী নিষ্পাপ চেহারার মেয়ে কিন্তু কী ভয়ংকর নিষ্ঠুর!"

রতন বলল, "ছেড়ে দাও।"

"একজন আরেকজনকে ধরে কী খিলখিল হাসি।"

"ছেড়ে দাও।"

"শুধু মেডিকেল স্টুডেন্ট না, আস্তে আস্তে নার্স ওয়ার্ডবয় সবাই আসতে লাগল।"

"ছেড়ে দাও।"

"তারপর রোগীরা আসতে শুরু করল।"

"ছেড়ে দাও।"

"তারপর রোগীদের আত্মীয় স্বজন"

"ছেড়ে দাও।"

মানিকের গলাটা ধরে এল। ভাঙা গলায় বলল, "তারপর আত্মীয় স্বজনের আত্মীয় স্বজন—"

রতন বুঝতে পারল বিষয়টা একটু বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। তাই সে মানিককে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "চল, আমাদের এখন সাপের বাজারে যাওয়ার কথা।"

মানিক বলল, "চল। বিষাক্ত সাপ দেখে আমাকে বিষাক্ত স্মৃতির কথা ভুলতে হবে।"

এক সপ্তাহ পর রতন মানিককে একটা ছোটো বাক্স দিয়ে বলল, "এটা তোমার জন্যে উপহার।"

বাক্সটা খুব সুন্দর, রঙিন কাগজে মোড়ানো। দেখে মানিকের চোখমুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠল, বলল, "আমার জন্যে উপহার?"

"হ্যাঁ।"

"আমার উপহার পেতে খুব ভালো লাগে।"

"সবারই ভালো লাগে, কিন্তু আমি জানি না, এই উপহারটা তোমার ভালো লাগবে কি না।"

"কেন?"

রতন বলল, "তার কারণ এটা একটা যন্ত্র। তুমি তো বলেছ তুমি যন্ত্র পছন্দ করো না।"

মানিকের মুখটা একটু বিমর্ষ হয়ে গেল, বলল, "যন্ত্র? কী যন্ত্র?"

"খুবই সোজা যন্ত্র। একটা এলার্ম ক্লক। তুমি বলেছিলে তোমার সকালে উঠতে সমস্যা হয় সেই জন্যে তৈরি করে দিলাম।"

"এলার্ম ক্লক? এলার্ম ক্লক তোমার তৈরি করতে হলো? আমি মাসে চার-পাঁচটা এলার্ম ক্লক কিনি! কিনি আর ভাঙি।"

"সেইজন্যেই তো তৈরি করে দিলাম। এটা ভাঙবে না। আর এই এলার্ম ক্লকটার মনে করো গণ্ডারের চামড়া, তুমি যতই অপমান করো, গালাগাল করো সে সবকিছু সহ্য করবে। তোমার যেভাবে খুশি তুমি এটাকে অপমান করতে পারবে।"

মানিকের মুখের বিমর্ষ ভাবটা এবারে একটু কমল, বলল, "অপমান করতে পারব?"

"পারবে।"

"দূরে ছুঁড়ে মারতে পারব?"

"অবশ্যই।"

"চমৎকার।" বলে মানিক রঙিন কাগজের মোড়কটাকে খুলে ভেতর থেকে একটা এলার্ম ক্লক বের করল, একেবারেই সাধারণ এলার্ম ক্লক, সে প্রায় নিয়মিত এরকম এলার্ম ক্লক বাজার থেকে কিনে আনে। তবে বাজার থেকে যেটা কিনে আনে সেগুলোর থেকে এটা একটু ভারি।

মানিক বলল, "তুমি এত বড়ো বৈজ্ঞানিক, কত কিছু আবিষ্কার করে ফেলতে পার, ড্রাইভার ছাড়া গাড়ি চালাতে পার। আর তুমি কি না তৈরি করলে একটা এলার্ম ক্লক!"

রতন হাসল, বলল, "তোমার জন্যে আলাদা করে তৈরি করেছি!"

"যখন বাজতে শুরু করবে তখন টিপি দিলেই বন্ধ হয়ে যাবে তো?"

"হ্যাঁ। টিপি দিলেই বন্ধ হয়ে যাবে। আমি সকাল সাতটার জন্যে সেট করে দিয়েছি। তুমি ইচ্ছে করলে এটা অন্য সময়ের জন্যে সেট করতে পার।"

মানিক বলল, "সাতটাই ভালো। এলার্ম ক্লক ঘুমটাকে একটু হালকা করে দেয়। আবার নতুন করে ঘুমাই—তখন খুবই ভালো লাগে। দশটা এগারোটার দিকে যখন উঠি তখন শরীরটা একেবারে ঝরঝরে লাগে।"

রতন বলল, "ভেরি গুড।"

সেদিন রাত্রে ঘুমানোর সময় রতন মানিককে ফোন করল, বলল, "মানিক, ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি?"

"শুয়েছি। এখনো ঘুমাইনি।"

"কাত হয়ে শুয়ে কাত হয়ে থাকা টেলিভিশন দেখছ?"

"ঠিকই অনুমান করেছ।"

"আমি তোমাকে ফোন করলাম, মনে করিয়ে দেবার জন্যে। এলার্ম ক্লকটা সেট করেছ তো?"

মানিক বলল, "তোমার চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। আমি এলার্মটা সেট করে আমার মাথার কাছে রেখেছি।"

"গুড। আর শোনো—আমি আজ রাতে একটু শ্রীমঙ্গলের দিকে যাচ্ছি। সপ্তাহখানেকের জন্যে। এক সপ্তাহ পরে দেখা হবে।"

"ঠিক আছে। আমি ফোন করে তোমার খোঁজ নেব।"

রতন বলল, "আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে দুই দিকে টিলা, টেলিফোনের নেটওয়ার্ক নাই। ফোন করে মনে হয় আমাকে পাবে না।"

"কোনো সমস্যা নেই।"

মানিক ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনি যে আসলে অনেক বড়ো সমস্যা তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

ঠিক ভোর সাতটার সময় রতনের দেওয়া এলার্ম ক্লকটা বেজে উঠল। প্রথমে এলার্ম ক্লকের শব্দটা হলো মিষ্টি একটা বাজনার মতো, মানিক সেই শব্দটা প্রায় উপভোগ করতে শুরু করছিল ঠিক তখন সেটা কর্কশ শব্দ করতে শুরু করল। মানিক ঘুম ঘুম চোখে হাত বাড়িয়ে এলার্ম ক্লকটা ধরার

চেষ্টা করতেই একটা খুব বিচিত্র ব্যাপার ঘটল। এলার্ম ক্লকটা ছোটো একটা লাফ দিয়ে সরে গেল। শুধু যে সরে গেল তা না, সরে গিয়ে আরো কর্কশ শব্দে বাজতে লাগল। সারাজীবন মানিকের জীবনে যেটা ঘটেনি আজকে সেটা ঘটে গেল, তার এত সাধের ঘুমটা একটা চোট খেয়ে গেল। সে চোখ মেলে দেখার চেষ্টা করল সত্যিই এলার্ম ক্লকটা লাফ দিয়ে সরে গেছে নাকি তার চোখের ভুল।

মানিক দেখল এলার্ম ক্লকটা সত্যিই একটু দূরে বসে বিকট স্বরে চিৎকার করছে। সে হাত বাড়িয়ে আবার সেটা ধরার চেষ্টা করল আর কী আশ্চর্য সেটা সত্যি সত্যি ব্যাঙের মতো একটা লাফ দিয়ে মাথার কাছে রাখা টেবিলটার অন্য পাশে সরে গেল। শুধু তাই না, মনে হলো এলার্ম ক্লকটা আরো জোরে শব্দ করতে শুরু করেছে।

মানিকের ঘুমটা এখন পুরোপুরি ভেঙে গেল। সে তার বিছানায় উঠে বসে এক ধরনের বিস্ময় আর আতঙ্ক নিয়ে এলার্ম ক্লকটার দিকে তাকিয়ে থাকে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে আবার এলার্ম ক্লকটা ধরার চেষ্টা করল আর কী আশ্চর্য এবারে সেটা লাফ দিয়ে মেঝেতে নেমে এল। নিজের চোখে দেখেও মানিকের বিশ্বাস হতে চায় না। তার ভেতরে কেমন যেন একটা জেদ চেপে যায়, সে আবার সেটাকে ধরার চেষ্টা করল আর এলার্ম ক্লকটা আবার লাফ দিয়ে সরে গেল। এবারে সে দুই হাতে সেটাকে জাপটে ধরার চেষ্টা করল, প্রায় ধরেই ফেলেছিল আর একেবারে শেষ মুহূর্তে সেটা পিছলে গিয়ে হাত ফসকে বের হয়ে গেল। এলার্ম ক্লকটার শব্দটা এবারে কেমন যেন একটা হাসির মতো শোনাতে থাকে।

মানিক এবারে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল, সাথে সথে এলার্ম ক্লকটা হঠাৎ থেমে গেল। বিকট একটা কর্কশ আওয়াজ থেমে যাবার পর পুরো ঘরটা মানিকের কাছে কেমন যেন বেশি নীরব মনে হতে থাকে। বুকের ভেতর থেকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বের করে দিয়ে মানিক আবার তার বিছানায় বসে পড়ে আর সাথে সাথে এলার্ম ক্লকটা আগের চেয়ে জোরে চিৎকার করতে শুরু করে। মানিক ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো লাফ দিয়ে আবার উঠে দাঁড়ায় আর সাথে সাথে বিকট আওয়াজটা থেমে যায়।

মানিক বুঝতে পারল এই এলার্ম ক্লকটা তাকে বিছানা থেকে নামিয়ে ছাড়বে। বিছানায় বসলেই এটা চিৎকার করবে।

এতক্ষণে মানিকের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, সে জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। তার এত সাধের সকালের ঘুমের পুরোপুরি বারোটা বেজে গেছে। মানিক আরেকবার সাহস করে এলার্ম ক্লকটা ধরার চেষ্টা করল, সাথে সাথে এলার্ম ক্লকটা লাফ দিয়ে সরে গিয়ে আবার বিকট একটা শব্দ করে মানিককে জানিয়ে দিল যে তাকে ঘাঁটাঘাঁটি করলে সে আবার শব্দ করতে শুরু করবে।

মানিক কী করবে বুঝতে না পেরে এক পা পিছনে গেল, এলার্ম ক্লকটা কোনো কিছু করল না। সে ডান দিকে দুই পা এগিয়ে গেল তখন এলার্ম ক্লকটাও নিজে থেকে ডান দিকে ঘুরে গেল। মানিক বাম দিকে একটু সরে এল। আর কী আশ্চর্য! এলার্ম ক্লকটাও বাম দিকে ঘুরে গেল। মানিকের পরিষ্কার একটা অনুভূতি হলো যে এলার্ম ক্লকটা তার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে। মানিক সাবধানে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করল সাথে সাথে এলার্ম ক্লকটা বিকট স্বরে চিৎকার শুরু করে। মানিক তখন তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এল, এলার্ম ক্লকটাও সাথে সাথে থেমে গেল। মানিক বুঝতে পারল এই এলার্ম ক্লকটা তাকে বিছানায় শুতে দিতে চায় না—সে যেন অন্য কোনো ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তে না পারে সেজন্যে চোখের আড়ালও করতে চায় না।

মানিক কবি মানুষ। সে সহজে রেগে ওঠে না, রেগে উঠলেও সে কখনোই মাথা গরম করে না, একটু আধটু মাথা গরম করলেও সে কখনো গলা উঁচু করে কথা বলে না। কিন্তু আজকে সব নিয়ম ভেঙে সে হাত পা নেড়ে চিৎকার করে এলার্ম ক্লকটাকে বলল, "বেটা বদমাইস! বেজন্মা কোথাকার, তোর এত বড়ো সাহস—"

আর যায় কোথায়! এলার্ম ক্লকটা তার জায়গায় একটা ছোটো লাফ দিয়ে বিকট স্বরে চিৎকার করতে থাকে, সেই চিৎকার এত ভয়ংকর যে মানিকের প্রায় হার্টফেল করার অবস্থা। সে প্রায় না বুঝেই দুই হাত জোড় করে মাপ চাওয়ার ভঙ্গি করে নরম গলায় বলতে থাকে, "প্লিজ! প্লিজ! প্লিজ! রাগ করো না—আর কখনো বলব না—মাপ করে দাও—"

এলার্ম ক্লকের শব্দটা তখন আস্তে আস্তে কমতে থাকে। তারপর একসময় থেমে যায়। মানিকের তখন বুঝতে বাকি থাকে না, এলার্ম ক্লকটা শুধু যে তাকে চোখেচোখে রাখতে চায় তা না, সেটার সাথে গলা উঁচু করে কথাও বলা যাবে না! মানিক এক ধরনের হিংস্র দৃষ্টিতে এলার্ম ক্লকটার দিকে তাকিয়ে থাকে তার এখনো বিশ্বাস হয় না একটা এলার্ম ক্লক তাকে এরকম বিপদে ফেলতে পারে। সে তখন সাবধানে এগিয়ে টেবিলের একপাশে রাখা তার মোবাইল টেলিফোনটা হাতে নিয়ে রতনকে ফোন করল। অন্য পাশে রতন নেই কিন্তু মানিক রতনের গলা শুনতে পেল, "মানিক, এটা আমি না, এটা আমার রেকর্ডিং—"

মানিক দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "আমি তোমার রেকর্ডিংয়ের বংশ নিপাত করি—"

"তুমি আমাকে কিছু বলছ কি না আমি জানি না—" রেকর্ডিং বলে চলল, "খামোখা চেষ্টা করো না, আমি শুনতে পাব না। যেহেতু তুমি ফোন করছ আমি ধরে নিচ্ছি আমার এলার্ম ক্লকটা ঠিক ঠিক সময়ে তোমাকে ঘুম থেকে তুলতে পেরেছে। হা হা হা—যাই হোক এলার্ম ক্লকটা ধরতে পারলে এটাকে তুমি বন্ধ করে দিতে পারবে—কিন্তু তোমাকে বলা হয়নি এটাকে ধরা খুব সোজা না। আমি আমার রিয়েল টইম ডাইনামিক এলগরিদম এটার মাঝে ঢুকিয়ে দিয়েছি। তোমার বাসায় এই এলগরিদমের ফিল্ড টেস্ট হচ্ছে। ফিরে এসে আমি তোমার কাছ থেকে রিপোর্ট নেব।"

মানিক দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, "তোমার ফিল্ড টেস্টের চৌদ্দগুষ্টির নিপাত করি।"

রতনের গলার রেকর্ডিং বলতে লাগল, "আরো একটা কথা মানিক, তোমাকে বলা হয়নি। যন্ত্রপাতিকে তুমি অপমান করতে পছন্দ কর, কাজেই এটাকে তুমি যতো ইচ্ছা অপমান করতে পার, শুধু খেয়াল রাখবে গলার স্বর যেন উঁচু না হয়। তার কারণ এটার মাঝে সংবেদনশীল কণ্ঠস্বর পরিমাপের সফটওয়ারটাও আছে। হা হা হা।"

রতনের কথা পুরোপুরি শেষ হবার আগেই মানিক তার মোবাইল টেলিফোনটা মেঝেতে ছুড়ে মারল, শক্ত মোবাইল সেট, এটা দিয়ে সে দেওয়ালে পেরেক ঠুকে ঢুকিয়ে দেয় সেটার কিছু হলো বলে মনে হলো না।

শুধু এলার্ম ক্লকটা নিজের জায়গায় একটা লাফ দিয়ে ঘুরে মানিকের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘণ্টাখানেক পর মনে হলো এলার্ম ক্লকটা একটু শান্ত হয়েছে, মানিক তখন খুব সাবধানে শোবার ঘর থেকে বের হয়ে বাইরের ঘরে এসে তার সোফায় বসে পড়ল। অবাক ব্যাপার হলো এলার্ম ক্লকটা ছোটো ছোটো লাফ দিয়ে তার পিছু পিছু শোবার ঘরে চলে এল। দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সেটা তাকে চোখে চোখে রাখছে। মানিক সোফায় বসে দুই হাতে তার মাথা চেপে ধরে পুরো ব্যাপারটা ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করার চেষ্টা করল, লাভ হলো না, প্রত্যেকবারই তার মাথা আগের থেকে গরম হয়ে উঠতে লাগল। একটা তুচ্ছ এলার্ম ক্লক তাকে এভাবে অপদস্ত করবে সেটা মানিক কোনদিন কি চিন্তা করেছিল? সে খানিকক্ষণ সোফায় বসে লম্বা লম্বা কয়েকটা নিশ্বাস ফেলল— তার প্রিয় একটা কবিতার লাইন আবৃত্তি করে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল, তাতেও খুব একটা লাভ হলো না, বরং তার মাথায় অন্য একটা কবিতার লাইন ঝিলিক করে উঠে, "এক ডান্ডায় ঠান্ডা করে দাও পৃথিবীর যত এলার্ম ক্লক..."

ঠিক এরকম সময় খুট করে বাইরের দরজা খুলে ময়নার মা ঘরে ঢুকল। ময়নার মা মানিকের ঘরদোর পরিষ্কার করে রান্নাবান্না করে দেয়, সে যখন আসে তখন ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে দিতে মানিকের আলসেমি লাগে তাই সে তার দরজার একটা চাবি ময়নার মাকে দিয়ে রেখেছে। ময়নার মা এভাবে বাসার চাবি নিতে আপত্তি করছিল, মানিক শোনেনি। জোর করে দিয়ে দিয়েছে। ময়নার মা দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে সোফায় মানিককে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেল, বলল, "বাই! আপনি আজকে এত সকালে জাগুইন্যা?"

মানিক বলল, "বাই বলে কোনো শব্দ নেই। শব্দ হচ্ছে ভাই। আর জাগুইন্যা বলে তুমি যদি জেগে ওঠা বুঝিয়ে থাক তাহলে হ্যাঁ আমি জাগুইন্যা।"

"কেন বাই? কোনো সমিস্যা?"

"সমিস্যা বলেও কোনো শব্দ নেই। শব্দটা সমস্যা। হ্যাঁ অনেক বড়ো সমস্যা। কিন্তু তুমি সেটা নিয়ে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না।"

"জে আচ্ছা।"

মানিক লক্ষ করল ময়নার মায়ের পিছন থেকে একটা ছোটো মাথা উঁকি দিল, এলোমেলো চুল বড়ো বড়ো চোখ। চোখে খানিকটা কৌতূহল এবং অনেকখানি ভয়। ময়নার মা বলল, "আমার মেয়ে ময়না।"

"আশ্চর্য! তোমার সত্যি সত্যি ময়না নামে মেয়ে আছে? আমি ভেবেছিলাম তোমার নামই হচ্ছে ময়নার মা।" মানিক তখন ছোটো মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল, "ময়না। আমার বাসায় তোমাকে স্বাগতম। আমি খুবই দুঃখিত আমার বাসায় তোমাকে আনন্দ দেবার মতো কিছু নেই।"

মানিকের কথা শুনে ময়না ভয় পেয়ে আবার তার মায়ের পিছনে লুকিয়ে গেল। ময়নার মা তখন ময়নাকে ধরে ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বলল, "ময়না নামটা রাখা ঠিক হয় নাই। নাম রাখা উচিত ছিল কাউয়া।"

"শব্দটা কাউয়া না। শব্দটা কাক। তোমার এরকম ফুটফুটে মেয়ের নাম কাক রাখবে কেন? এরকম কথা মুখে আনাই রীতিমতো অপরাধ।"

ময়নার মা কোমরে গুঁজে রাখা একটা দড়ি বের করে ময়নার পায়ে বাঁধতে বাঁধতে বলল, "জন্মের দুষ্টু। জেবনটা তাবা করে দিল।"

মানিক ময়নার পায়ে দড়ি বাঁধতে দেখে অবাক হয়ে গেল, "জেবন" আর "তাবা" নামে দুটি বিচিত্র শব্দ পর্যন্ত হজম করে বলল, "তুমি ওর পায়ে দড়ি দিয়ে বাঁধছ কেন?"

"সব সময় বেন্ধে রাখি। আপনি ঘুমায়ে থাকেন সেই জন্যে আপনি জানেন না। দড়ি দিয়ে টেবিলের সাথে বেন্ধে রাখি সে টেবিলের নীচে বসে বসে খেলে। আমারে ডিস্টার্ব দেয় না।"

"ডিস্টার্ব একটা ইংরেজি শব্দ। বাংলা বাক্যে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা ঠিক না। কিন্তু সেটা নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। আমি তোমাকে পরিষ্কার করে বলতে চাই, ময়নার মা, তুমি কিছুতেই একজন শিশুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে পারবে না। কিছুতেই না।"

ময়নার মা একটু হকচকিয়ে গেল, বলল, "বাই। যেদিন ময়নারে নিয়া আসতি হয়—আমি দড়ি দিয়ে বেন্ধে রাখি। তা না হলে বাসার মদ্যি ঘুরি

বেড়াবি। জিনিসপত্রে হাত দিবি।"

মানিক বলল, "আমার বাসায় বই ছাড়া কোনো জিনিসপত্র নেই। একটা ফুটফুটে মেয়ে যদি আমার বইয়ে হাত দেয় আমি খুবই খুশি হব। সেই বই যদি সে খুলে পড়ে আরো বেশি খুশি হব।" মানিক মেঘস্বরে বলে, "তুমি ময়নার পায়ের দড়ি খুলে দাও। সে বাসার মাঝে ছুটোছুটি করুক।"

"কিন্তু—"

"কোনো কিন্তু নেই।"

কাজেই ময়নার মাকে ময়নার পায়ের দড়ি খুলে দিতে হলো। ময়নার মুখে খুব সূক্ষ্ম একটা আনন্দের হাসি উঁকি দিয়ে গেল।

মানিক বলল, "ময়না, তুমি এই বাসায় যত ইচ্ছা ঘুরে বেড়াতে পার। যেটা ইচ্ছে ধরতে পার, শুধু—" মানিক মেঝেতে নিরীহভাবে বসে থাকা এলার্ম ক্লকটা দেখিয়ে বলল, "এই ঘড়িটা থেকে সাবধান।"

ময়নার মা বলল, "ঘড়ি ফোলোরের উপর রাখছেন কেন?"

"তুমি নিশ্চয়ই ফ্লোর বলার চেষ্টা করছ। মেঝে বলে একটা চমৎকার বাংলা শব্দ থাকার পরও তুমি কেন ভুল উচ্চারণে ফ্লোর বলার চেষ্টা করছ আমি জানি না। যাই হোক ময়নার মা, আমি এই ঘড়িটা মেঝেতে রাখিনি। কেমন করে এটা মেঝেতে এসেছে আমি সেটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। তুমি যদি এটাকে ধরে এই বাসা থেকে দূর করতে পার তোমাকে আমি বিশেষ বোনাস দেব।"

"ঘড়িটা ফালায়া দিমু?"

"হ্যাঁ।"

ময়নার মা এগিয়ে এসে এলার্ম ক্লকটা ধরার চেষ্টা করল আর সাথে সাথে সেটা ছোটো একটা শব্দ করে লাফ দিয়ে সরে গেল। ময়নার মা ভয় পেয়ে একটা বিকট চিৎকার দিয়ে পিছনে সরে এল এবং তখন প্রথমবারের মতো ময়নার মুখে সত্যিকারের আনন্দের হাসি ফুটে ওঠে। মানিক লক্ষ করল ময়নার সামনের কয়েকটা দাঁত নেই এবং দাঁতহীন এই হাসিটার মতো সুন্দর কিছু সে বহুদিন দেখছে কি না মনে করতে পারল না।

ময়নার মা দরজা ধরে বড়ো বড়ো নিশ্বাস নিয়ে নিজের বুকে থুতু দিয়ে চোখ বিস্ফারিত করে এলার্ম ক্লকটার দিকে তাকিয়ে রইল এবং ময়না আনন্দে চিৎকার করে এলার্ম ক্লকটা ধরার জন্যে সেটার উপর লাফিয়ে পড়ল। এলার্ম ক্লকটা ছোটো একটা শব্দ করে লাফ দিয়ে সরে যায়, ময়না সেটাকে একটুর জন্যে ধরতে পারে না। তারপর যেটা ঘটল সেটার জন্যে মানিক একেবারে প্রস্তুত ছিল না, মানিক অবাক হয়ে দেখল ময়না তার ফোকলা দাঁত বের করে খিলখিল করে হাসতে হাসতে একেবারে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। এই ব্যাপারটাতে যে সত্যি সত্যি আনন্দের একটা বিষয় আছে এই প্রথম মানিক সেটা লক্ষ করল। ময়না একটু পরেই আবার উঠে দাঁড়ায় তারপর আবার সেটা ধরার চেষ্টা করল, এলার্ম ক্লকটা আবার লাফ দিয়ে সরে গেল আর ময়না আবার খিলখিল করে হাসতে লাগল! ময়নার হাসি দেখে মানিকও প্রথমে মৃদুভাবে এবং একটু পরে উচ্চস্বরে হাসতে থাকে—একটা মজার জিনিসকে সে বোকার মতো ভয়ের জিনিস ভেবে আছে সেটা এই বাচ্চা মেয়েটা তাকে প্রথমবার বুঝিয়ে দিল।

ময়না এলার্ম ক্লকটাকে নিয়ে সারা ঘরে লুটোপুটি খেল, কখনো কখনো ঘরের কোণায় প্রায় চেপে ধরল, শেষ মুহূর্তে মনে হয় ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিল! ময়নার মা যখন কাজ শেষ করে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে তখন মানিক স্পষ্ট বুঝতে পারল এলার্ম ক্লকটা রীতিমতো নেতিয়ে পড়েছে। ময়না সেটাকে খুব সহজেই ধরে ফেলল তারপর যে দড়ি দিয়ে তাকে বাঁধা হতো সেই দড়ি দিয়ে এলার্ম ক্লকটাকে বেঁধে ফেলল। মানুষ যেভাবে পোষা কুকুরকে দড়ি বেঁধে নিয়ে যায় ময়না সেভাবে এলার্ম ক্লকটাকে বেঁধে নিয়ে গেল। মানিক মুখে কৌতুকের হাসি নিয়ে দেখল এলার্ম ক্লকটা গোবেচারার মতো ছোটো ছোটো লাফ দিয়ে ময়নার পিছু পিছু যাচ্ছে!

পরদিন ভোরবেলা টেলিফোনের শব্দে মানিকের ঘুম ভাঙল। সে ঘুমঘুম গলায় ফোন ধরল, "কে?"

"আমি রতন।"

"ও! রতন।" আমি এখন ঘুমাচ্ছি, তুমি ঘণ্টাদুয়েক পর ফোন করতে পারবে? জরুরি কথা আছে।"

অন্যপাশ থেকে রতন চিৎকার করে বলল, "ঘুমাচ্ছ! এখনো ঘুমাচ্ছ! এলার্ম ক্লক তোমাকে তুলে দেয়নি?"

মানিক ঘুমঘুম গলায় বলল, "হ্যাঁ। তোমার এলার্ম ক্লক নিয়েই কথা। পরে ফোন কর।"

মানিক ফোন রেখে দেয়, রতন স্পষ্ট শুনতে পেল মানিক হালকাভাবে নাক ডাকতে শুরু করেছে।

ঘণ্টাদুয়েক পর রতন যখন আবার ফোন করেছে মানিক তখনও ঘুমাচ্ছে। আরো ঘণ্টাদুয়েক পর যখন ফোন করছে তখন মানিকের ঘুম ভেঙেছে কিন্তু সে এখনো বিছানা থেকে নামেনি। রতন জিজ্ঞেস করল, "এলার্ম ক্লক তোমাকে ঘুম থেকে তুলতে পারেনি? এখনো ঘুমাচ্ছ?"

"এখন উঠে যাব। কাল ভালো ঘুম হয়নি তো তাই আজ একটু পুষিয়ে নিলাম। ভালোই হয়েছে তুমি ফোন করেছ, আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। হ্যাঁ তোমার এলার্ম ক্লকটা নিয়ে, এটা বাচ্চাদের জন্যে অসাধারণ একটা খেলনা হতে পারে।"

রতন খাবি খেল, "খেলনা!"

"হ্যাঁ। ছোটো বাচ্চারা এটার পিছনে দৌড়াদৌড়ি করে এটাকে ধরতে অসম্ভব পছন্দ করে। দড়ি দিয়ে বেঁধে নিলে এটা পোষা কুকুরের মতো পিছন-পিছনে যায়।"

"পোষা কুকুর?"

"হ্যাঁ। তুমি যদি চাও তাহলে আমি খেলনা কোম্পানির সাথে কথা বলতে পারি। আমার পরিচিত একজন ইন্ডাস্ট্রিতে আছে। সে অবশ্যি জাহাজ বানায়। যে জাহাজ বানাতে পারে সে কি খেলনা বানাতে পারবে না?"

"জাহাজ?"

"খেলনাটার একটা মজার নাম দিতে হবে। আমার কী মনে হয় জানো, এর মজার একটা নাম হতে পারে ডুগুডুগু।"

"ডুগুডুগু?"

"হ্যাঁ। ডুগুডুগু।"

সারাদেশের বাচ্চাদের খুব শখের খেলনা ডুগুডুগুর এই হচ্ছে জন্ম ইতিহাস।

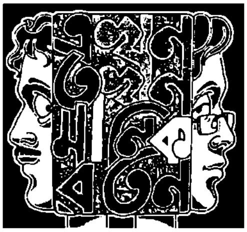

কালাচান ধলাচান

রতন একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে টেবিলের উপর রাখা ছোটো একটা যন্ত্রকে খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছিল। মানিক প্রায় একইরকম মনোযোগ দিয়ে রতনকে পরীক্ষা করতে করতে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "একসময় আমার ধারণা ছিল তুমি একজন বড়ো বিজ্ঞানী।"

রতন ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে টেবিলের উপর রাখা ছোটো যন্ত্রটা দেখতে দেখতে বলল, "এখন তোমার কী ধারণা হয়েছে?"

"এখন ধারণা নয়, এখন আমি নিশ্চিতভাবে জানি তুমি আসলে বিজ্ঞানী না।"

"আমি তাহলে কী?"

"তুমি হচ্ছ টয়-মেকার। খেলনা প্রস্তুতকারক। তুমি দিনের পর দিন বসে বসে খেলনা বানাও। এই যেরকম তুমি দিনের পর দিন বসে বসে দুটি হাত বানাচ্ছ। পুতুলের হাত।"

রতন কোনো কথা না বলে পুতুলের হাতের মতো যন্ত্রটা মানিককে দেখিয়ে বলল, "এটা?"

"হ্যাঁ, দুই হাত বানাতে দুই মাস। তারপর পা বাকি আছে। তারপর মাথা ঘাড় বুক পিঠ উরু—"

রতন বলল, "তোমার দুঃশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই হাত দুটি বানানোর পর আমার কাজ শেষ। মাথা পিঠ বুক এসব বানাতে হবে না।"

মানিক বিরক্ত হয়ে বলল, "কী আবোল-তাবোল বলছ? ঠিক করে বল।"

রতন অবাক হয়ে বলল, "ঠিক করে বলব? কী ঠিক করে বলব?"

"বলো, মাথা ঘাড় বুক পিঠ উরু—ছন্দ দিয়ে বলো।"

"রতন হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, আমার বলারই দরকার নাই। তুমি বলো। আমি শুনি।"

মানিক বলল, "কিন্তু তার আগে তুমি বলো হাত দুটো বানানোর পর তোমার কাজ শেষ কেন? একটা পুতুলের শুধু হাত থাকে না। সবকিছু থাকে।"

"আর যদি পুতুল না হয় তাহলে কি সবকিছু থাকতে হবে?"

"পুতুল না হলে মানে?"

"মানে এটা পুতুলের হাত না। এই দুটি হাত আসলে রবোটিক হ্যান্ড। ইলেকট্রনিক সিগনাল দিয়ে এটা কন্ট্রোল করা যাবে। এই দুটো হাত সূক্ষ্মভাবে কাজ করতে পারবে। আর এটা কন্ট্রোল করার জন্যে যে ইন্টারফেসটা তৈরি করতে হয়েছে সেটা বানাতে আমার জান বের হয়ে গেছে। মাইক্রোস্কপিক আইসি কিনতে হয়েছে। যে এলগরিদম তৈরি করতে হয়েছে—"

মানিক রতনকে বাধা দিয়ে বলল, "তুমি তোমার ভ্যাদর-ভ্যাদর থামাবে?"

রতন থতমত খেয়ে গিয়ে বলল, "আমি ভেবেছিলাম তুমি জানতে চাইছ—"

"আমি মোটেও তোমার আলু-করলা-দম শুনতে চাচ্ছি না।"

"শব্দটা আলু-করলা-দম না, শব্দটা এলগরিদম। তোমার শুদ্ধ করে বলা উচিত। অন্তত চেষ্টা করা উচিত।"

মানিক মুখ শক্ত করে বলল, "শুধু আমি শুদ্ধ বলার চেষ্টা করব, আর সারা পৃথিবীর মানুষ যা খুশি বলবে, যা খুশি লিখবে তাতে দোষ নেই?"

রতন জিজ্ঞেস করে, "কে কী বলেছে? কী লিখেছে?"

মানিক তার হাতে ধরে রাখা পত্রিকাটা খুলে বলল, "এই দেখো পত্রিকার একটা বিজ্ঞাপন—" তারপর জোরে জোরে পড়ে শোনাল, "কাকের বাচ্চা চাই। বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হইবে।"

রতন ইতস্তত করে বলল, "এই বিজ্ঞাপনের সমস্যা কী?"

"পরিষ্কার গুরুচণ্ডালী। চলিত এবং সাধুর মিশ্রণ। কবিগুরু এই বিজ্ঞাপনটা দেখলে আত্মহত্যা করতেন। যে এই ভাষায় বিজ্ঞাপন লিখে তাকে একুশে ফেব্রুয়ারি ভোরবেলা শহীদ মিনারে গুলি করে মারা উচিত।"

রতন মাথা চুলকে বলল, "আসলে, মানে হয়েছে কী এই বিজ্ঞাপনটা আমি পত্রিকায় পাঠিয়েছিলাম। ভাষার ব্যাপারটা মানে—"

মানিক চোখ বড়ো বড়ো করে রতনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি? তুমি এই বিজ্ঞাপন দিয়েছ? তু-তুমি?"

"হ্যাঁ। আমি।"

"কাকের বাচ্চা দিয়ে তুমি কী করবে?"

"আমার পরের প্রজেক্টটা হচ্ছে পাখি নিয়ে।"

"পাখি নিয়ে গবেষণা করতে চাও করো, আমার যত আপত্তি থাকুক আমি মেনে নেব। তাই বলে কাক? কাক নিয়ে গবেষণা?"

"কাক হচ্ছে—"

মানিক রতনকে কথা শেষ করতে দিল না, বলল, "কাক নিয়ে কোনো কবিকে কবিতা লিখতে দেখেছ? কোনো শিল্পীকে গান গাইতে শুনেছ? ভাস্করকে ভাস্কর্য বানাতে দেখেছ?"

"আমি তো কাকের উপর গান গাইব না। আমি কাককে নিয়ে—"

মানিক আবার রতনকে থামিয়ে দিল, "এটা টিয়া পাখি হতে পারত। কাকাতুয়া হতে পারত, কবুতর হতো পারত এমনকি শালিক হতে পারত, কিন্তু তাই বলে কাক?"

"আসলে হয়েছে কী—"

"আমি হচ্ছি কবি মানুষ। কবিরা সুন্দরের পূজারি। তুমি আমাকে বল কাকের মাঝে কোনো সৌন্দর্য আছে? তার গলার স্বর কর্কশ। প্রিয় খাবার মরা ইঁদুর। প্রিয় খেলা ছোটো শিশুর হাত থেকে ছোঁ মেরে খাবার নিয়ে যাওয়া—"

কয়েকবার কাকের বিষয়টা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে কোনো সুবিধে করতে না পেরে রতন আবার তার রবোটিক হ্যান্ডের উপর ঝুঁকে পড়ল।

মানিক তার পাশে বসে টানা কথা বলে যেতে লাগল। বক্তব্য কাক থেকে চিল, চিল থেকে শকুন এবং শকুন থেকে শেষে মনুষ্যরূপী শকুন প্রজাতির দিকে যেতে লাগল।

মানিক যখন রতনের কানের কাছে নিশ্বাস না ফেলে টানা কথা বলতে থাকে রতন তখন খুব সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করতে পারে, তার সমস্যার নানারকম সমাধান বের করে ফেলে। এবারেও সে দুই দুইটা জটিল সমস্যা কীভাবে সমাধান করবে বের করে ফেলল। মানিকের সাথে পরিচয় হবার পর নিঃসন্দেহে তার গবেষণার কাজ অনেক ভালো হতে শুরু করেছে।

দুদিন পর লোকজন কাকের বাচ্চা নিয়ে আসতে শুরু করল। বিজ্ঞাপনে গুরুচণ্ডালী থাকলেও মানুষজন বিজ্ঞাপনের ভাষা পড়ে মানিকের মতো এত উত্তেজিত হলো না। প্রথম যে এলো তার সুচালো মুখ এবং তার সুচালো গোঁফ। চোখেমুখে একটা ধুরন্ধরের ভাব। রতনকে দেখে জিজ্ঞেস করল, "পত্রিকায় আপনি বিজ্ঞাপন দিছিলেন?"

ভাগ্যিস আশেপাশে মানিক ছিল না, সে শুদ্ধ ভাষা ছাড়া কথা বলে না, তার সামনে দিয়েছিলেন না বলে দিছিলেন বললে তার কপালে দুঃখ থাকে। রতন অবশ্যি ভাষা নিয়ে মাথা ঘামাল না, বলল, "হ্যাঁ। আমি দিয়েছিলাম।"

"বিজ্ঞাপন পরিষ্কার হয় নাইক্কা। আপনি বলেন নাই কয়টা কাউয়ার বাচ্চা লাগবি। খুচরা না পাইকারি।"

রতন কখনো চিন্তা করে নাই এরকম একটা ব্যাপার হতে পারে। ভুরু কুঁচকে বলল, "আপনি কয়টা দিতে পারবেন?"

"সেইটা নির্ভর করে দামের ওপরে। পার পিছ কাউচার বাচ্চা কত করে দিবেন?"

"সেটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করতে পারি। আগে আপনি দেখান। কয়টা এনেছেন?"

"সেম্পল হিসেবে একটা আনছি।"

"দেখান।"

মানুষটা তার হাতের ছোটো বাক্সটা থেকে খুব সাবধানে একটা মুরগির বাচ্চা বের করল। ছোটো এবং হলদে রঙের শরীরে কোমল পালক। বাক্স থেকে বের হয়ে এদিক সেদিক তাকিয়ে কিউ কিউ করে ডাকল।

রতন মুখ শক্ত করে বলল, "এটা কাকের বাচ্চা না। এটা মুরগির বাচ্চা।"

মানুষটা মুখ আরো বেশি শক্ত করে বলল, "এইটা কাউয়ার বাচ্চা।

রতন বলল, "আমি আপনার সাথে তর্ক করতে চাই না। এটা কাকের বাচ্চা না। আপনি একটা মুরগির বাচ্চা নিয়ে এসেছেন।"

"কাউচার বাচ্চা ছোট্ট থাকতি মুরগির বাচ্চার মতন থাকে। বড়ো হলি কাউয়ার বাচ্চার মতন হয়। হলুদ লোম পড়ে কালা লোম ওঠে।"

"আমি সেটা নিয়েও কথা বলতে চাই না। আপনি মুরগির বাচ্চাটাকে নিয়ে যান। আমি এটাকে কাকের বাচ্চা হিসেবে কিনব না। মুরগির বাচ্চাটাকে কষ্ট দিবেন না। যেখান থেকে এনেছেন সেখানে ফেরত দিয়ে দেবেন।"

মানুষটা তখন খুবই বিরস মুখে মুরগির বাচ্চাটা তার বাক্সে ঢোকাল। তারপর বলল, "কামটা ঠিক হইল না।"

রতন জিজ্ঞেস করল, "কোন কাজটা ঠিক হলো না?"

"আমারে পয়সা খরচ কইরা পুরান ঢাকা থেকি আনলেন। এখন বলেন আমার কাউয়ার বাচ্চা নিবেন না। এইটা নাকি মুরগির বাচ্চা! আপনার কারণে আমার বিশাল লস।"

রতন কিছু জিজ্ঞেস না করে ধুরন্ধর চেহারার মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইল। মানুষটা বলল, "অন্তত আমারে ট্যাস্‌কি ভাড়টা দেন।"

"আপনাকে ট্যাক্সি ভাড়া দিতে হবে?"

"একশ বার। আমারে আপনে চিনেন না। পুরান ঢাকায় আমারে সবাই চিনে। আমি যেইটা বলি সেইটাই ফাইনাল। মুরগির বাচ্চা কইলে মুরগির বাচ্চা। কাউয়ার বাচ্চা বললে কাউয়ার বাচ্চা। পুলিশের সার্জেন্ট পর্যন্ত আমারে দেখলে সেলাম দেয়।"

মানুষটা তখন বুকের কাছে শার্টের একটা বোতাম খুলে শার্টের কলারটা সোজা করল। রতন বলল, "ঠিক আছে।"

তারপর গলা উঁচিয়ে ডাকল, "টাইগার!" সাথে সাথে বাঘের মতো গর্জন করে ভিতর থেকে এলসেশিয়ান কুকুরটা ডেকে উঠল, তারপর ভারি গলায় গর্জন করতে করতে ছুটে আসতে থাকে।

কুকুরের ডাকে ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। পুরান ঢাকার বিখ্যাত মাস্তান চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। রতন আগেও দেখেছে ভারি গলায় কুকুরের ডাকের এই রেকর্ডিংটা সব সময়ে ম্যাজিকের মতো কাজ করে। সে এমনভাবে এটা রেডি করেছে যে, টাইগার বলে ডাকলেই রেকর্ডিংটা বেজে ওঠে। ডাকটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। মনে হয় ভেতর থেকে বাইরে ছুটে আসছে।

কাকের বাচ্চা নিয়ে দ্বিতীয় যে মানুষটি এলো সেও মহা ধুরন্ধর, সত্যি কথা বলতে কী সে পুরান ঢাকার মাস্তান থেকেও বড়ো ধুরন্ধর। সেও একটা মুরগির বাচ্চা নিয়ে এসেছে কিন্তু সে এনেছে কালো রং করে। রতন মুরগির বাচ্চাটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "কাজটা ঠিক করেননি।"

মানুষটা কিছু বুঝতে পারেনি সেরকম ভান করে বলল, "কোন কাজটা?"

"এই যে মুরগির বাচ্চাকে আলকাতরা দিয়ে কালো রং করে নিয়ে চলে এসেছেন। এত ছোটো বাচ্চাটা তো এখন মরে যাবে।"

মানুষটা জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু। এটা মোটেও আলকাতরার রং না, এটা পাকা রং।"

"পাকা হতে পারে কিন্তু আমি আলকাতরার গন্ধ পাচ্ছি। রংটা এখনো কাঁচা, হাত দিলে হাতে উঠে আসছে।"

মানুষটা তখন খুব অবাক হবার ভান করে বলল, "কী আশ্চর্য! এই জন্যে মানুষকে বিশ্বাস করতে নাই। আমি অফিসের স্টাফকে দায়িত্ব দিয়েছি, ব্যাটা যেন আমাকে কাকের বাচ্চা এনে দেয়, আর সে কী দিয়েছে দেখলেন? মুরগির বাচ্চাকে আলকাতরাতে চুবিয়ে দিয়ে দিয়েছে। ব্যাটা বদমাইস, আজকেই ব্যাটাকে তাড়িয়ে দেব! চাকরি নট করে দিব।"

রতন কোনো কথা না বলে মানুষটাকে আলকাতরা দিয়ে কালো রং করা মুরগির বাচ্চাটা ফিরিয়ে দিল। মানুষটা তার বাক্সে সেটা ভরে তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেল। রতনের এবারে টাইগারকে ডাকতে হলো না।

এভাবে সারাদিনই নানা ধরনের মানুষ নানাকিছু নিয়ে আসতে লাগল। একজন একটা আধমরা কাক নিয়ে এসে বলল, এটা কাকের বাচ্চা, তার বাপ মা তাকে বেশি বেশি মরা ইঁদুর খাইয়ে তাড়াতাড়ি বড়ো করে ফেলেছে। একজন কয়েকটা ডিম নিয়ে এসে বলল, এটার ভিতরে কাকের বাচ্চা আছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবে। (রতন টেবিলে ডিমটাকে দুই পাক দিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, ভেতরে বাচ্চা নেই, বাচ্চা থাকলে মোমেন্ট অফ ইনারশিয়ার কারণে ভিন্ন এংগুলার মোমেন্টাম হতো—কিছু না বুঝে লোকটা মুখ কালো করে ফেরত গেল) একজন কয়েকটা কালো কবুতরের বাচ্চা কাকের বাচ্চা হিসেবে গছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল।

সত্যিকারের কাকের বাচ্চা নিয়ে এলো দশ বারো বছরের একটা ছেলে। ছেলেটার জ্বলজ্বলে চোখ উশকোখুশকো চুল এবং সারা শরীরে অসংখ্য কাটাছেঁড়া। পলিথিনের ব্যাগে দুইটা কাকের বাচ্চা রতনের সামনে রেখে বলল, "হুশ!"

হুশ মানে কী কিংবা কেন বলা হয় রতন জানে না, তাই সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না। বাচ্চাটাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কী হয়েছে? শরীরে এত কাটাছেঁড়া, ছাল ওঠা কেন?"

"বদমাইস কাকগুলি এটাক করেছিল। যখন কাকের বাচ্চা নিচ্ছিলাম তখন হাজার হাজার কাক এসে আমাকে আক্রমণ করেছে।"

রতন সত্যি সত্যি একটু ভয় পেয়ে বলল, "সর্বনাশ!"

"চারটা বাচ্চা ছিল। দুইটা রেখে এসেছি কাকের ফেমিলির জন্যে। বদমাইশগুলি জানে না ছোটো পরিবার সুখী পরিবার।"

"তুমি ব্যথা পাওনি তো?"

"পাই নাই আবার। কাকের ঠোঁট কী ভয়ংকর জানেন?"

"তুমি এত ছোটো ছেলে এরকম একটা ডেঞ্জারাস কাজ করতে গেলে! কাকেরা খুব দল বেঁধে থাকে।"

ছেলেটা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, "হুশ!"

রতন পলিথিনের ব্যাগ থেকে কাকের দুইটা বাচ্চা বের করে টেবিলে রাখল। শরীরে কোনো পালক নেই, মনে হয় রোস্ট করার জন্যে কেউ ছোটো ছোটো মোরগের বাচ্চার পালক তুলে ফেলেছে। কাকের বাচ্চা দুটি একটা আরেকটার সাথে জড়াজড়ি করে মুখ হা করে নড়তে লাগল।

রতন বলল, "ফ্যান্টাস্টিক! কোথায় পেলে বাচ্চাগুলো?"

"আমাদের ফ্ল্যাট চারতলায়, পাশে বাড়িওয়ালার আম গাছ আছে। সেই আম গাছে কাক বাসা করে ডিম পেড়েছে। আমাদের ফ্ল্যাট থেকে দেখা যায়। কালকে মাত্র ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়েছে।"

"ভেরি গুড।" ছোটো ছেলেমেয়েদের সাথে কীভাবে কথা চালিয়ে যেতে হয় রতনের জানা নেই, তাই কী বলবে বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, "তুমি বুঝি পত্রিকায় বিজ্ঞাপনটা দেখেছিলে?"

বাচ্চাটা মাথা নাড়ল, বলল, "সেটা অনেক লম্বা স্টোরি।"

"লম্বা স্টোরি?"

"হ্যাঁ। হুশ!"

"কী স্টোরি?"

"ফাটাফাটি একটা সায়েন্স ফিকশানের বই বের হয়েছে। আব্বুকে কিনে দিতে বললাম। আব্বু কানে ধরে একটা চটকানি দিয়ে বলল, পাঠ্যবই বাদ দিয়ে আউট বই পড়বে! নো মোর আউটবুক। যেদিন নিজে পয়সা কামাই করবি সেইদিন নিজের পয়সা দিয়ে আউটবুক কিনবি।"

ছেলেটা একটু থামল, রতন জিজ্ঞেস করল, "তারপর?"

"তখন নিজে কীভাবে পয়সা কামাই করা যায় সেইটা দেখার জন্যে পত্রিকাটা ঘাঁটাঘাঁটি করলাম। তখন বিজ্ঞাপনটা দেখেছি।" ছেলেটার মুখে এগাল-ওগাল জোড়া হাসি ফুটে উঠল, বলল "আমার জন্যে এক্কেবারে মিলে গেছে। শুধু বদমাইশ কাকের গুষ্টি কাকগুলো বড়ো ঝামেলা করেছে।"

রতন মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। দল বেঁধে কাক যখন এটাক করে সেটা খুব ডেঞ্জারাস। আলফ্রেড হিচককের এরকম একটা সিনেমা আছে, নাম দি বার্ডস।"

ছেলেটার সিনেমা নিয়ে খুব আগ্রহ আছে বলে মনে হলো না, জিজ্ঞেস করল, "কাকের বাচ্চা দিয়ে কী করবেন?"

"পাখি নিয়ে আমার একটা থিওরি আছে সেটা সত্যি কি না টেস্ট করব।"

ছেলেটার চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল, "আপনি সাইন্টিস্ট?"

"বলতে পারো!"

"আপনি গবেষণা করেন? আপনার ল্যাবরেটরি আছে?"

"মোটামুটি একটা আছে।"

ছেলেটার চোখ আরো বড়ো বড়ো হয়ে গেল, বলল, "হুশ!"

রতন বলল, "তোমার কাকের বাচ্চার জন্যে কত দিতে হবে? বেশ কয়েকটা সায়েন্স ফিকশানের বই যেন নিতে পার সেরকম দিলে কি হবে?"

ছেলেটা বলল, "আপনাকে টাকা দিতে হবে না। আমি আগে কখনো সাইন্টিস্ট দেখি নাই। আজকে দেখলাম। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে আপনাকে আমি ফ্রি কাকের বাচ্চা দিয়ে গেলাম।"

"সে কী!"

"হ্যাঁ। ফ্রি! গবেষণার জন্য আর কী লাগবে বলেন। সেগুলাও দিয়ে যাব।"

"আপাতত কিছু লাগবে না। কিন্তু তোমার ফ্রি কাকের বাচ্চা দিতে হবে না।" রতন তখন তাড়াতাড়ি একটা খামে কয়েকটা বড়ো বড়ো নোট ভরে ছেলেটির হাতে ধরিয়ে দিল। ছেলেটার জীবনের প্রথম উপার্জন এটা, তার মনে রাখার মতো হলেই ভালো। ছেলেটা খামটা হাতে নিয়ে বলল, "হুশ!"

"তোমার নামটা কী?"

"মিঠু। বন্ধুরা ডাকে—" ছেলেটা কথা শেষ না করে থেমে গেল।

"বন্ধুরা কী ডকে?"

"মৃত্যু।"

"মৃত্যু? কী সর্বনাশ! তোমাকে মৃত্যু ডাকে কেন?"

"আমাকে ভয় পায় তো সেই জন্যে!"

"তোমাকে ভয় পায় কেন?"

"কী জানি!" ছেলেটা এই আলাপটা চালিয়ে যেতে বেশি উৎসাহ দেখাল না। কিন্তু রতন অনুমান করতে পারল। যে ছেলে হাজার হাজার কাকের আক্রমণকে পরোয়া না করে কাকের বাসা থেকে তার বাচ্চা ছিনতাই করে নিয়ে আসতে পারে তাকে মনে হয় একটু ভয় পাওয়াই যেতে পারে।

খামটা হাতে নিয়ে চলে যেতে যেতে ছেলেটা থেমে গেল, ফিরে এসে বলল, "আমি কি মাঝে মাঝে এসে এই কাকের বাচ্চাকে দেখে যেতে পারব?"

রতন বলল, "অবশ্যই! যখন ইচ্ছা। তুমি যদি চাও তাহলে তোমার বাসার টেলিফোন নম্বর দিয়ে যেতে পার। দেখানোর মতো কিছু হলে তোমাকে ফোন করে আমি খবর দিয়ে দিব।"

মিঠু খানিকক্ষণ কিছু-একটা চিন্তা করে বলল, "আব্বুর টেলিফোন নম্বর দিয়ে লাভ নাই, উলটো ধরে আমাকে পিটুনি দিবে। আম্মুর নম্বর দিয়েও লাভ নেই, ফোনটাই ধরবে না। আপুর নম্বরটা দিতে পারি। মেজাজ ভালো থাকলে আমাকে ফোন দিতেও পারে।"

"ঠিক আছে, তাহলে তোমার বোনের নম্বরটাই দিয়ে যাও।"

মিঠু রতনকে তার বোনের টেলিফোন নম্বরটা দিয়ে গেল।

মানিক কাকের বাচ্চা দুটিকে দেখল একদিন পর। রতন টেবিলের উপর বাচ্চা দুটোকে রেখে একটা সিরিঞ্জ দিয়ে খাবার খাওয়াচ্ছিল, মানিক দেখে চিৎকার শুরু করল, "কী? এগুলো কী?"

রতন বলল, "কাকের বাচ্চা।"

"কাকের বাচ্চা এরকম কেন? এদের পালক কে ছিঁড়েছে?"

"কেউ ছিঁড়েনি। এদের পালক এখনো গজায়নি।"

"কী কুৎসিত! দেখে মনে হচ্ছে কেউ এদের ন্যাংটো করে রেখেছে!"

রতন একটা কাকের বাচ্চার মুখে সিরিঞ্জটা ধরে চাপ দিয়ে খানিকটা খাবার ঢুকিয়ে দিতেই বাচ্চাটা আগ্রহ নিয়ে সেটা খেতে থাকে। দ্বিতীয় বাচ্চাটা তখন মুখ হা করে এগিয়ে আসে।

মানিক বলল, “শুধু কুৎসিত নয়। এগুলো নির্লজ্জের মতো ক্ষুধার্ত এবং লোভী। এদের খাওয়ার মাঝে কোনো সৌন্দর্য নেই।”

রতন বলল, “খাওয়ার মাঝে যে সৌন্দর্য থাকে আমি জানতাম না।”

মানিক বলল, “এই বাচ্চা দুটি যে শুধু কুৎসিত তাই নয় এরা যখন খাচ্ছে তখন বাথরুম করছে। ইয়াক থু, ছিঃ।”

রতন বলল, “তোমার মা বেঁচে থাকলে আমি তার সাথে দেখা করে জিজ্ঞেস করতাম, যখন তুমি খুব ছোটো ছিলে তখন তুমিও খাওয়ার সময় বাথরুম করতে কি না।”

মানিক কথাটা না শোনার ভান করে বলল, এতকিছু থাকতে তুমি কেন দুটি কাকের বাচ্চার পিছনে এত সময় দিচ্ছ?”

“পাখি নিয়ে আমার একটা থিওরি আছে, আমি সেটা টেস্ট করব।”

“সেটি কী?”

“তুমি নিশ্চয়ই জান পাখিরা খুব বুদ্ধিমান।”

মানিক মাথা নাড়ল, বলল, “আমি জানি না।”

“ঠিক আছে না জানলেও সমস্যা নেই। এখন জানলে। বুদ্ধিমান প্রাণী তাদের হাত দিয়ে অনেক কিছু করে। পাখিদের হাত নেই, যে দুটো অংশ হাত হতে পারত সেগুলো হয়ে গেছে পাখা। কাজেই আমরা যে কাজগুলো হাত দিয়ে করি, পাখিদের সেগুলো করতে হয় ঠোঁট দিয়ে।”

“তাতে সমস্যাটা কী?”

“কোনো সমস্যা নেই। শুধু একদিন হাত ব্যবহার না করে মুখ দিয়ে জুতার ফিতা বাঁধার চেষ্টা কর।”

“আমি কেন মুখ দিয়ে জুতার ফিতে বাঁধব?”

“ঠিক আছে বাঁধতে না চাইলে বেঁধো না। কিন্তু যদি বাঁধতে চেষ্টা করতে তাহলে বুঝতে পারতে মুখের তুলনায় হাত দিয়ে কাজ করা কত সহজ! হাত দিয়ে কাজ করতে পারলে তুমি অনেক কিছু করতে পারো, হাত না থাকলে তুমি কিছুই পারো না।”

“আমি এখনো বুঝতে পারছি না তুমি কী বলতে চাইছ।”

"তার কারণ আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা এখনো বলিনি। এখন বলি, তুমি শোনো। পাখিরা অনেক বুদ্ধিমান হলেও তারা কিছুই করতে পারে না, কারণ তাদের হাত নেই। তাদের যদি হাত থাকত তাহলে তারা না জানি কতো কিছু করতে পারত। সেজন্যে—"

"সেজন্যে কী?"

"সেজন্যে আমি তাদের শরীরে দুটো ছোটো ছোটো রবোটিক হাত লাগিয়ে দিতে চাই। দেখতে চাই তখন তারা তাদের বুদ্ধি ব্যবহার করে সেই হাত দিয়ে কী করে।"

"তার মানে তুমি যে দুই মাস সময় লাগিয়ে পুতুলের দুইটা হাত তৈরি করেছ সেগুলো আসলে এই কাকের বাচ্চাদের জন্যে?"

রতন বলল, "তুমি ঠিক অনুমান করেছ।"

"আমি এখনো পুরোটুকু অনুমান করতে পারিনি। ছোটো ছোটো হাত লাগাতে চাও ভালো, কিন্তু এই কুৎসিত বাচ্চাগুলোকে কেন? এত ছোটো বাচ্চা নিজে খেতেই পারে না সে হাত দিয়ে কী করবে?"

"একবার বড়ো হয়ে গেলে সে আর হাত ব্যবহার করতে পারবে না। ছোটো থাকতে চেষ্টা করলে সেটাকে অভ্যস্ত করানো যাবে।"

মানিক অনেকক্ষণ কথা না বলে চুপ করে রইল, তারপর ফোঁস করে একটা বড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমি সবকিছু বুঝতে পেরেছি শুধু একটা জিনিস এখনো বুঝতে পারিনি।"

রতন জিজ্ঞেস করল, "কী?"

"পৃথিবীতে এত বিচিত্র পাখি রয়েছে, এত সুন্দর সুন্দর পাখি রয়েছে, সবকিছু ছেড়ে তুমি কাককে কেন বেছে নিলে? কালো কুৎসিত কদাকার কাক?"

রতন বলল, "তার কারণ পাখিদের মাঝে কাক হচ্ছে সবচেয়ে বুদ্ধিমান। কাকদের বলে পাখিদের আইনস্টাইন।"

"পাখিদের আইনস্টাইন?"

"হ্যাঁ।"

মানিক তখন আবার একটা লম্বা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, "পাখিদের যদি আইনস্টাইন থাকে তাহলে কি পাখিদের শেকস্‌পিয়ার আছে?"

"নিশ্চয়ই আছে?"

"সেটি কোন পাখি?"

"আমি জানি না। প্যাঁচা হতে পারে।"

"প্যাঁচা? প্যাঁচা কেন হবে?"

রতন বলল, "কবি সাহিত্যিকদের কথা মনে হলেই আমার কেন জানি মনে হয় একজন মুখ ভোঁতা করে বসে আছে, অনেকটা প্যাঁচার মতো।"

মানিক চোখ গরম করে রতনের দিকে তাকাল, বলল, "তুমি অত্যন্ত অশোভন একটা কথা বলেছ।"

রতন মাথা নাড়ল, বলল, "আমার যেটা মনে হয় সেটা বলেছি। আমি কী করব? আগে শুধু একটা ভাসা-ভাসা ধারণা ছিল তোমাকে দেখে ধারণাটা পাকা হয়েছে।"

মানিক মুখটা প্যাঁচার মতো করে বসে রইল। রতন গভীর মনোযোগ দিয়ে কাকের বাচ্চা দুটোকে খাওয়াতে লাগল।

কাকের বাচ্চা দুটির ডানায় রবোটিক হাত লাগানোর কাজটা মোটেও সহজ হলো না। বাচ্চা দুটি খুবই বিরক্ত হলো এবং যতবার দুটো হাত লাগানো হলো ততবার সেগুলো খুঁটে খুঁটে খুলে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল। রতন হাল ছাড়ল না, সে অনেকভাবে চেষ্টা করে হাতগুলো লাগিয়ে যেতে লাগল। রতনের ধৈর্যের শেষ নেই তাই কাকের বাচ্চা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল এবং দেখা গেল তাদের দুই ডানা থেকে ছোটো ছোটো দুটো হাত লম্বা হয়ে বের হয়ে এসেছে। সেখানে এখনো কোনো কানেকশান দেয়া হয়নি, রতন প্রথমে কাকের বাচ্চাগুলোকে তাদের রবোটিক হাতে অভ্যস্ত করতে চায়। যখন অভ্যস্ত হয়ে যাবে তখন হাত দুটোকে চালু করা যাবে।

মানিক যখন দেখতে এলো তখন কাকের বাচ্চা দুটি তাদের বাড়তি হাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ডানা থেকে দুটি হাত সোজা সামনের দিকে বের

হয়ে এসেছে। যখন কানেকশান দেয়া হবে তখন সেগুলো ভাঁজ হবে, নড়বে—এই মুহূর্তে সেগুলো দুটো ছোটো ছোটো কাঠি ছাড়া আর কিছু নয়।

এর মাঝে রতন কাকের বাচ্চা দুটির জন্যে থাকার জায়গা করেছে। তার বাসার পিছনে খোলা জায়গাটা সে নেট দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। ভেতরে কয়েকটা গাছও আছে। সেরকম একটা গাছে সে একটা বাক্স বসিয়ে তাদের বাসা তৈরি করেছে। ভিতরে কাঠকুটো দিয়ে তৈরি কাকের বাসা। বাচ্চা দুটো সেখানে থাকতে আপত্তি করে না। রতন ঘড়ি ধরে বাচ্চাগুলোকে খাওয়ায়। বাচ্চাগুলো এখন রতনকে দেখলেই মুখ হা করে তার দিকে এগিয়ে আসে, রতন আদর করে খাইয়ে দেয়। কাকের বাচ্চা দুটোর গায়ে ছোটো ছোটো কালো পালক উঠতে শুরু করেছে সেই ল্যাদল্যাদা পালকছেঁড়া ভাবটা আর নেই। বাচ্চাগুলো রতনের গলার স্বরেও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। ডাকলে তারা সাড়া দেয়। রতন বাচ্চা দুটোর নাম দিয়েছে কালাচান এবং ধলাচান। দেখতে দুটো একইরকম, রতন অবশ্যি আলাদা করতে পারে, চোখের রং গায়ের পালক আর পাখার গঠনে ছোটোখাটো পার্থক্য আছে যেটা রতন ছাড়া আর কারো চোখে ধরা পড়ে না।

মানিক কাকের বাচ্চা দুটির দিকে এক ধরনের বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, "শুধু কাকের বাচ্চা দেখতে যথেষ্ট খারাপ। এখন এই দুটো ঘটঘটিক হাত লাগানোর পর এদের দেখতে আরো খারাপ লাগছে।"

রতন বলল, "শব্দটা ঘটঘটিক না। রবোটিক।"

"এক কথা। আমার কানে রবোটিক আর ঘটঘটিক আলাদা কোনো ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে না। আমার কাছে দুটিই এক।"

রতন কোনো উত্তর না দিয়ে কাকের বাচ্চা দুটোর কাছে গিয়ে ডাকল, "কালাচান, ধলাচান এদিকে আসো।"

রতনের ডাক শুনে দুটো বাচ্চাই হাঁচড়পাঁচড় করে তার দিকে এগিয়ে এসে, তার হাতে ওঠার চেষ্টা করতে থাকে। মানিক চোখ কপালে তুলে বলল, "কী বললে, কী বললে তুমি?"

রতন বলল, "আমি বাচ্চা দুটোকে ডাকলাম। একটার নাম কালাচান আরেকটা ধলাচান।"

"হায়, হায় হায়! তুমি এ কী করেছ? এরকম দুটো অমার্জিত শব্দ ব্যবহার করে নাম রেখেছ? নাম দেয়ার আগে তুমি আমাকে কেন জিজ্ঞেস করলে না? এদের নাম হতে পারত কৃষ্ণকলি, একটা কৃষ্ণ আরেকটা কলি।"

রতন তার হাতের উপর উঠে বসে থাকা বাচ্চা দুটোকে আদর করতে করতে বলল, "আমি বুঝতে পারিনি তুমি এদের নাম দিতে চাইবে। আমি ভেবেছিলাম তুমি এদের দুইচোখে দেখতে পার না।"

মানিক বলল, "অবশ্যই দুই চোখে দেখতে পারি না। তাই বলে দুটো সুন্দর নাম দিতে আপত্তি করব কে বলেছে?"

রতন ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বলল, "ছেড়ে দাও! আমার তো কালাচান আর ধলাচান নাম দুটো ভালোই লাগছে। ডাকলে কি সুন্দর সাড়া দেয় দেখেছ?"

রতন ব্যাপারটা দেখানোর জন্য ডাকল, "কালাচান" সাথে সাথে একটা বাচ্চা তার পাখা নেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে সাড়া দিল। তারপর ডাকল, "ধলাচান"। তখন অন্যটা পাখা নেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে সাড়া দিল।

মানিক হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "কী ভয়ানক! তুমি কি কালা আর ধলা শব্দের মানে জানো না? কালা মানে কালো, ধলা মানে সাদা। এর মাঝে সাদা কাক কি আছে? তাহলে সাদা নাম কেন দিলে?

রতন বলল, "আমি কি আসলেই রতন? তুমি কি আসলেই মানিক? কিন্তু আমাদের নাম রতন আর মানিক। তাতে কার কী সমস্যা হয়েছে?"

মানিক বলল, "তাই বলে কালো আর ধলার মতো এরকম অমার্জিত শব্দ?"

রতন উত্তর না দিয়ে কালাচান আর ধলাচানকে আদর করতে লাগল। শব্দ কেমন করে অমার্জিত হয় সেটা সে বোঝে না।

এর মাঝে একদিন মিঠু, যাকে তার ক্লাশের ছেলেমেয়েরা মৃত্যু বলে ডাকে, কাকের বাচ্চা দুটো দেখতে এল। সে অবশ্যি একা আসেনি। তার সাথে আরো দুইজন এসেছে, চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে তাদের নাম মৃত্যু না হলেও গজব কিংবা তাণ্ডব হওয়ারই কথা। কাকের বাচ্চার যে জিনিসগুলো মানিক অপছন্দ করেছিল মিঠু আর তার বন্ধুরা সে জিনিসগুলোই পছন্দ করল। কালাচান এবং ধলাচান নাম দুটো তাদের খুবই পছন্দ হলো, হাতে কিল দিয়ে মিঠু বলল, "ফাটাফাটি নাম! হুশ!"

ছোটো ছোটো রবোটিক হাত দেখে তারা মুগ্ধ হয়ে গেল। বলল, "ফ্যান্টাস্টিক! এক্কেবারে বুংগাবুংগি। হুশ! হুশ!'

রতন বুংগাবুংগি শব্দটা আগে কোনোদিন শোনেনি, তাই তার মানে বুঝতে পারল না। কিন্তু অনুমান করল এটাও 'ফাটাফাটি' অর্থ বোঝানোর জন্যে তৈরি করা একটা শব্দ হবে।

মিঠু জিজ্ঞেস করল, "কালাচান ধলাচান কি রবোটিক হাত নাড়াতে পারে?"

"এখনো হাত নাড়ানোর ট্রেনিং দেই নাই। প্রথমে অন্য ট্রেনিং দিচ্ছি।"

"কী ট্রেনিং?"

"টয়লেট ট্রেনিং।"

মিঠু এবং তার দুই বন্ধু অবাক হয়ে বলল, "টয়লেট ট্রেনিং?"

রতন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। পাখিদের নিয়ে কাজ করার এই হচ্ছে সমস্যা। যখন তখন বাথরুম করে দেয়। এ জন্যে কালাচান আর ধলাচানকে ট্রেনিং দিচ্ছি। যখন তখন বাথরুম করবে না। যখন বলবে তখন করবে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। ট্রেনিং মোটামুটি কমপ্লিট। এখনো মাঝে মাঝে একসিডেন্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেটা তো হবেই। মানুষেরই হয় এরা তো কাকের বাচ্চা।"

মিঠু বলল, "হুশ! কী রকম ট্রেনিং, দেখানো যাবে?"

"হ্যাঁ। এই দেখ।" বলে কালাচান আর ধলাচানকে ঘরের এক কোনায় নিয়ে গেল, সেখানে একটা ছোটো বাক্স তার ভেতরে খবরের কাগজ বিছানো। বাক্সের ওপর কালাচান আর ধলাচানকে ধরে বলল, "পিচিক।"

সাথে সাথে পিচিক করে একই সাথে কালাচান ধলাচান বাথরুম করল। সেটা দেখে মিঠু আর তার দুই বন্ধু আনন্দে হাততালি দিয়ে বলল, "ঝিংগা মিংগা।"

ঝিংগা মিংগা শব্দটাও রতন জানে না, ধরে নিল এটাও বুংগাবুংগি কিংবা ফাটাফাটির মতো কোনো শব্দ হবে। বোঝাই যাচ্ছে শব্দটা আনন্দ প্রকাশ করার শব্দ, শব্দটা কালাচানের ধলাচানের জন্যে একটু বেশি হয়ে গেল, ভয় পেয়ে তারা ওড়ার চেষ্টা করল, এখনো উড়তে শেখেনি। তাই ডানা ঝাপটে তারা নীচে এসে পড়ল। তারপর হাঁচড়পাঁচড় করে একটা কোনায় লুকানোর চেষ্টা করল।

রতন কালাচান ধলাচানকে আদর করে তুলে নিয়ে বলল, "আরে বোকা, এত অল্পে ভয় পেলে চলবে? এই দেশে থাকতে হলে আরো কতরকম শব্দ শুনতে হবে! তাই না মিঠু?"

মিঠু মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আপনার ট্রেনিংটা এক্কেবারে ফাটাফাটি। পিচিক বললেই বাথরুম—"

মিঠুর মুখে পিচিক শব্দটা শুনে আবার কালাচান ধলাচান বাথরুম করে দিল, রতন প্রস্তুত ছিল না বলে এবারে তার হাতের মাঝে!

মিঠু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "হায় হায়! আমি বুঝতে পারি নাই এই শব্দটা বললেই বাথরুম করে দেবে—"

রতন বলল, "কোনো সমস্যা নেই, এটা অনেকবার হয়েছে। আমার পরের প্রজেক্ট হচ্ছে পাখিদের জন্যে ডাইপার আবিষ্কার।"

কথাটা শুনে এই তিন রত্ন খুব মজা পেল। তারা খানিকক্ষণ হি হি করে হাসল। হাসি থামার পর তিনজনই হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে গেল, মিঠু বলল, "বুঝলি তোরা, এই কাকের বাচ্চা দিয়ে কী সাংঘাতিক কাজ করা যাবে।"

"কী কাজ?"

"এটা যখন উড়ে উড়ে কারো মাথার ওপর আসবে তখন আমরা এই শব্দটা বলব আর সাথে সাথে তার মাথায় বাথরুম করে দেবে।"

দৃশ্যটা কল্পনা করে তিনজন আবার আনন্দে হি হি করে হাসতে থাকে। অনেক কষ্ট করে হাসি থামিয়ে মিঠু বলল, "সবার আগে মোখলেস স্যারের মাথায়।"

"তারপর বিলকিস মিস।"

"তারপর শাহজাহান স্যার।"

"তারপর কুদ্দুস স্যার।"

"তারপর জাহানারা ম্যাডাম।"

একেকজন স্যার কিংবা ম্যাডামের নাম বলে আর তারা হেসে গড়াগড়ি খেতে থাকে, রতন এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। ব্যাপারটা কল্পনা করেই তাদের এত আনন্দ সত্যি সত্যি করতে পারলে না জানি কী হবে!

এর কয়েকদিন পর রতন কালাচান আর ধলাচানের রবোটিক হাতের সার্কিট প্রথমবারের মতো অন করল। তখন যা একটা ভয়ংকর ব্যাপার হলো তা বলার মতো না। হাত দুটি পুরোপুরি অনিয়ন্ত্রিতভাবে সামনে পিছনে ডানে বাঁয়ে নড়তে থাকে। হাতের আঙুল খুলতে থাকে বন্ধ হতে থাকে আর কাকের বাচ্চা দুটি ভয় পেয়ে ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করে দেয়। রতনকে তাই একটু পরেই সার্কিটের সুইচটা আবার বন্ধ করে দিতে হলো।

রতন অবশ্যি খুব নিরুৎসাহিত হলো না, শুরুতে এরকম কিছু-একটা ঘটবে সেটা অনুমান করেছিল। কাকের বাচ্চা দুটির হাতগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনতে অনেকদিন সময় লাগবে এটা সে ধরেই রেখেছিল। রতন ধৈর্য ধরে লেগে রইল, প্রত্যেকদিন একটু পর পর সে সার্কিট অন করতে থাকে।

এক সপ্তাহের মাথায় প্রথমে ধলাচান তার রবোটিক হাতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারল। ব্যাপারটা ঘটল হঠাৎ করেই, ধলাচান হঠাৎ করে বুঝে গেল কীভাবে হাত দুটিকে কাছে আনতে হয় আবার দূরে নিতে হয়। তখন সে বারবার হাত দুটিকে কাছে আনতে থাকে আবার দূরে নিতে থাকে।

কালাচান তখনও ব্যাপারটা ধরতে পারেনি—তার হাত দুটো মোটামুটি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে নড়ছে। ধলাচান তখন এসে কলাচানকে তার হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিল, দেখে মনে হলো কাজটা করে সে খুব মজা পেয়েছে।

কালাচানও পরের সপ্তাহ শেষ হবার আগেই তার নিজের হাত ব্যবহার করা শিখে গেল। তখন হাত দিয়ে একে অন্যকে ঠেলাঠেলি করা কালাচান ধলাচানের মজার একটা খেলা হয়ে দাঁড়াল।

কয়েকদিনের মধ্যেই তারা বুঝে গেল যে তাদের রবোটিক হাত দিয়ে তারা ঠেলাঠেলি ছাড়াও আরও মজার কাজ করতে পারে। তারা ইচ্ছে করলে কিছু-একটা ধরতে পারে। তারা তখন হাতের কাছে যেটাই পেল সেটাকেই ধরা শুরু করল, সেটাকে নাড়াচাড়া করা শুরু করল। ভুল করে একটা ফড়িং তাদের কাছে এসে হাজির হওয়ার পর সেটাকে যখন কালাচান খপ করে ধরে ফেলল তখন তাকে দেখে মনে হলো সে বুঝি রাজ্য জয় করে ফেলেছে!

রতন তাদের জন্যে কয়েকটা সাদা কাগজ বিছিয়ে দিল, তারপর সেখানে নানা রঙের কয়েকটা সাইনপেন রেখে দিল। কালাচান ধলাচান তাদের হাত দিয়ে কলমগুলো ধরে ধরে দেখল কিন্তু এটা দিয়ে কী করা যায় সেটা তারা বুঝতে পারল না। রতন তখন তার নিজের হাত দিয়ে রঙিন কলমগুলো দিয়ে কাগজে কিছু আঁকাজোখা করল। কালাচান আর ধলাচান খুব মনোযোগ দিয়ে সেটা দেখল। তারপর তারা নিজেরাই কলমগুলো ধরে কাগজে আঁকাজোখা শুরু করল। নানা রঙের দাগগুলো কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং ছাড়া আর কিছুই হলো না। কিন্তু তারপরেও তো সেটা সত্যিকার কাকের বাচ্চাদের নিজেদের হাতে আঁকা ছবি!

কালাচান এবং ধলাচানের আরো একটা বিষয়ে বেশ প্রতিভা আছে দেখা গেল। তাদের বাসায় ছোটো একটা ইলেকট্রিক অর্গান রেখে দেয়া হয়েছে। তারা সেটা বাজিয়ে নানা ধরনের শব্দ তৈরি করে। রতন খুব মনোযোগ দিয়ে সেটা শুনে বোঝার চেষ্টা করল এই শব্দগুলোর মাঝে কোনো সুর আছে কি না—কিন্তু সে কোনো সুর খুঁজে পেল না!

নানা অকাজে ব্যস্ত থাকার কারণে মানিকের অনেকদিন হলো রতনের বাসায় আসা হয়নি। কালাচান ধলাচানের কথা সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। তাই অনেকদিন পর এসে সে যখন দেখল টেবিলে একটা বড়ো কাগজ বিছানো এবং কালাচান আর ধলাচান দুজনে দুটো সাইনপেন দিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা ছবি আঁকছে তখন তার প্রায় একটা হার্ট এটাকের মতো অবস্থা হলো। সে তোতলাতে তোতলাতে জিজ্ঞেস করল, "এ-এ-এরা কী করছে?"

"ছবি আঁকছে।"

"ছবি? কাকের বাচ্চারা ছবি আঁকতে পারে?"

রতন কালাচান ধলাচানের একটা ছবি হাতে ধরে বলল, "এটাকে যদি ছবি বলতে রাজি থাক।"

মানিক কিছুক্ষণ ছবিটার দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর সেই দৃষ্টিতে প্রথমে এক ধরনের বিস্ময় তারপর মুগ্ধতা নেমে এল। মানিক নিশ্বাস বন্ধ করে বলল, "অসাধারণ!"

রতন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "অসাধারণ?"

"তুমি দেখছ না? মানুষের জীবনের ব্যর্থতা দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার কী অসাধারণ বিমূর্ত ছবি?"

"মানুষের? কালাচান ধলাচান এঁকেছে তাই এটা বড়োজোর কাকের জীবনের দুঃখ কষ্ট হতে পারে।"

মানিক খুবই বিরক্ত হলো, বলল, "সবকিছুকে সংকীর্ণ করে দেখা তোমার অভ্যাস। দৃষ্টিকে প্রসারিত কর। এই বিমূর্ত ছবির ভেতরকার সৌন্দর্য দেখার চেষ্টা কর।"

রতন দৃষ্টিকে প্রসারিত করে ছবির মাঝে শুধু কাকের ঠ্যাং আর বকের ঠ্যাংই দেখতে পেল। তাই মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে, তুমি যেহেতু এই ছবিতে সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছ, আমি এই ছবিটা তোমাকে বাঁধাই করে দিব, তুমি তোমার ড্রয়িংরুমে টানিয়ে রেখো।"

"ছবি বাঁধাই, কী বলছ? এই ছবির প্রদর্শনী করা সম্ভব! এই ছবি মিউজিয়ামে থাকা সম্ভব!"

রতন হাসি গোপন করে বলল, "আমি ভেবেছিলাম তুমি কাক পছন্দ কর না! তার আঁকা ছবি দেখে তুমি এত মুগ্ধ—"

মানিক মাথা নেড়ে বলল, "কাক সম্পর্কে আমার ধারণা সঠিক ছিল না। আসলে কাকদের নিয়ে কবিরা কবিতা লিখেছেন। জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন—হয়ত ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে—জয়নুল আবেদিন তাঁর দুর্ভিক্ষের ছবিতে কাকদের স্কেচ এঁকেছেন। ঈশপ পর্যন্ত কাকদের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে গল্প লিখেছেন! এখন তুমি দেখালে কাকেরা শিল্পী!"

রতন বলল, "আমার কালাচান ধলাচান শেষ পর্যন্ত তোমার মনের মতো হয়েছে শুনে খুশি হলাম।"

মানিক বলল, "এখন এদের নিয়ে কী করবে? এদের নান্দনিক অনুভূতিকে আরো বিকশিত করা যায় কীভাবে?"

রতন বলল, "আসলে আমি ঠিক করেছি এদের হাতগুলো খুলে এখন এদের ছেড়ে দেব।"

মানিক আঁতকে উঠে বলল, "কী বলছ তুমি?"

"হ্যাঁ। ঠিকই বলেছি।"

"কেন?"

পাখিদের নিয়ে আমার একটা থিওরি ছিল, যে পাখিদের হাত থাকলে তারা নানারকম কাজ করতে পারত। আমার সেই থিওরিটা প্রমাণ হয়ে গেছে, কাজেই আমার কাজ শেষ। এখন কালাচান ধলাচানকে ছেড়ে দেবার সময় হয়েছে।"

"ছেড়ে দেবে?" মানিক নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না, "তুমি এদের ছেড়ে দেবে?"

"হ্যাঁ। হাত থাকার কারণে তারা অনেক কিছু করতে পারে যেটা অন্য কাকেরা করতে পারে না। তাই কাকদের সমাজে অন্য কাকেরা মনে হয় কালাচান ধলাচানকে নিবে না। তাই হাত খুলে স্বভাবিক কাক বানিয়ে এখন এদের ছেড়ে দিতে হবে।"

মানিক বলল, "কখন ছাড়বে?"

"আজকেই ছেড়ে দেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মিঠুকে না দেখিয়ে ছাড়া ঠিক হবে না।"

"মিঠু কে?"

"যে বাচ্চাটা কালাচান ধলাচানকে এনে দিয়েছে।"

"তাকে কখন দেখাবে?"

"আমি তাকে ফোন করে খবর দিয়েছি, আজ কাল কোনো এক সময় চলে আসবে।"

মানিক কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইল, তারপর বলল, "রতন, তুমি মনে হয় একটা বিষয় বুঝতে পারছ না।"

"কী বিষয়?"

"তোমার এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা মানুষের জানা দরকার।"

"যুগান্তকারী আবিষ্কার?"

"হ্যাঁ। আমরা আগে জানতাম শুধু মানুষের বুঝি নান্দনিক বোধ আছে। তুমি দেখালে শুধু মানুষ নয় পাখিদের ভেতরেও সেই শিল্পবোধ আছে। সৃষ্টিশীলতা আছে। এই অসাধারণ সত্যটি আমাদের সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। সবাইকে জানাতে হবে—"

"সবাইকে জানাতে হবে?" রতন চোখ কপালে তুলে বলল, "সর্বনাশ!"

মানিক বলল, "সর্বনাশ? সর্বনাশ কেন হবে? আমি অনেক পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকদের চিনি। টেলিভিশন চ্যানেলের লোকজনকে চিনি। তাদের খবর দিলেই চলে আসবে। পত্র-পত্রিকায় সংবাদ ছাপাবে। টেলিভিশনে টক শো হবে। সাংবাদিক সম্মেলন হবে।"

রতন মাথা নেড়ে বলল, "মানিক, তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না। আমি দুইটা জিনিসকে ভয় পাই। কোমাডো ড্রাগন আর সাংবাদিক।"

মানিক মুখ শক্ত করে বলল, "কেন? তুমি সাংবাদিকদের কেন ভয় পাও? তুমি জান সাংবাদিকতা অনেক মহান পেশা।"

"সেই জন্যেই ভয় পাই। আমার নিরিবিলি জীবন একেবারে ছ্যাড়াব্যাড়া হয়ে যাবে।"

মানিক মেঘস্বরে বলল, "ছ্যাড়াব্যাড়া বলে বাংলা ভাষায় কোনো শব্দ নেই। শব্দটি অত্যন্ত অশালীন।"

"ঠিক আছে আমার জীবনটা আউলাঝাউলা হয়ে যাবে।"

"এই শব্দটিও যথেষ্ট অমার্জিত—কিন্তু সেটা আলোচনার বিষয় নয়। আমি জানতে চাই কেন তুমি সাংবাদিকদের ভয় পাও?"

"তার কারণ সাংবাদিকেরা বাড়িয়ে চাড়িয়ে সবকিছু বলবে, তখন অন্য সাংবাদিকেরা দেখতে আসবে। তারা আরো বাড়িয়ে চাড়িয়ে বলবে। তখন আরো সাংবাদিকেরা আসবে—এইভাবে সবার কাছে জানাজানি হয়ে যাবে! আমি সেটা চাই না। আমি নিরিবিলি নিজের কাজ করতে চাই।"

"কিন্তু এত বড়ো একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—"

রতন বলল, "আমি শুধু মজা করতে চাই। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের খেতা পুড়ি!"

মানিক হতাশভাবে মাথা নাড়ল, "খেতা পুড়ি খুবই অমার্জিত কথা। শব্দটা কাঁথা—"

"যাই হোক। আমি কোনো পাবলিসিটি চাই না। পাখি নিয়ে গবেষণা শেষ হয়েছে এখন নূতন গবেষণা হবে।"

"কিন্তু দেশের মানুষ এটা সম্পর্কে জানবে না? যদি না জানে—"

মানিক বিশাল একটা বক্তৃতা দেয়া শুরু করেছিল কিন্তু ঠিক তখন দরজায় শব্দ হলো। রতন দরজা খুলে দেখে মিঠু দাঁড়িয়ে আছে। আজকে তার সাথে একজন ছেলে এবং একজন মেয়ে। মিঠুকে যদি মৃত্যু ডাকা হয় তাহলে তার সাথে যে দুজন আছে তাদেরকে বিভীষিকা না হয় আতংক ডাকা যেতে পারে। তবে তাদের নাম বিভীষিকা বা আতংক নয়। ছেলেটির নাম গুল্লু, মেয়েটি রিমি।

মিঠু বলল, "এই যে এরা বিশ্বাস করতে চায় না আপনি কাকদের ট্রেনিং দিচ্ছেন।"

রিমি নামের মেয়েটি বলল, "মিঠু দশটা কথা বললে তার মাঝে নয়টা মিথ্যা কথা থাকে।"

মিঠু বলল, "কোনোদিনও না। আমি কোনোদিন মিথ্যা কথা বলি না।"

রিমি রতনের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই দেখেন, কত বড়ো মিথ্যা কথা বলল।"

রতন বলল, "অন্য সময় মিঠু কী বলে আমি জানি না এইবারে সত্যি কথাই বলেছে। আমি আসলেই দুটি কাকের বাচ্চাকে ট্রেনিং দিচ্ছি।"

রতন কথা শেষ করার আগেই বাচ্চাগুলো টেবিলে রাখা কালাচান ধলাচানকে দেখতে পেল। কালাচান তখন একটা বোতল খুলছে, ধলাচান আরেকটা বোতল খুলে দুই হাতে ধরে ঢক্‌ঢক্‌ করে কিছু-একটা খাচ্ছে। বাচ্চাগুলো বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে কাক দুটোর দিকে ছুটে গেল। মিঠু বলল, "হুশ!"

রিমি নামের মেয়েটি বলল, "মাইয়ারে মাইয়া!"

গুল্লু নামের দ্বিতীয় ছেলেটি বলল, "বুংগা বুংগা!"

রতন লক্ষ করল এই শব্দগুলো যে বাংলা ভাষায় নেই এবং শব্দগুলো যে অমার্জিত সেটা নিয়ে মানিক কোনো কথা বলল না বরং চোখ বড়ো বড়ো করে বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। মিঠু এবং তার পিছু পিছু ছেলে এবং মেয়েটি টেবিলটার দিকে এগিয়ে যায়। মিঠু চিৎকার করে ডাকল, "কালাচান! ধলাচান!"

কালাচান আর ধলাচান তাদের হাতের ড্রিংকের বোতল দুটি নীচে নামিয়ে মিঠুর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "কা। কা।"

মিঠু আনন্দে লাফ দিয়ে বলল, "আমার সাথে কথা বলেছে! কথা বলেছে! হুশ! হুশ!!"

তখন গুল্লু এবং রিমিও এগিয়ে গিয়ে কাক দুটোকে ডাকল, "কালাচান! ধলাচান!"

কাক দুটো তাদের কোল্ড ড্রিংকের বোতল থেকে মুখে ঢক্‌ঢক্‌ করে খানিকটা ড্রিংক ঢেলে গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "কা কা।"

বাচ্চাগুলো কাক দুটোকে ঘিরে লাফালাফি চেঁচামেচি করতে থাকে। মিঠু হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "হ্যান্ডশেক! হ্যান্ডশেক!"

রতন অবাক হয়ে দেখল, কলাচান কিছুক্ষণ মিঠুর হাতটার দিকে তাকিয়ে রইল তারপর নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল! মিঠু আনন্দে চিৎকার করে বলল, "হুশ!"

ছোটো বাচ্চাদের আনন্দ ভয়ংকর সংক্রামক একটা বিষয়। কালাচান ধলাচানকে ঘিরে তাদের আনন্দোল্লাস লাফ-ঝাঁপ দেখে কিছুক্ষণের মধ্যে রতন আর মানিকও অনেকটা ছেলেমানুষের মতো হয়ে গেল। তাদের সাথে হাসাহাসি করতে লাগল। কালাচান ধলাচানের প্রতিভার যে বিষয়গুলো রতন গবেষণা করেও বের করতে পারেনি কিছুক্ষণের মধ্যে বাচ্চাগুলো সেগুলোও আবিষ্কার করে ফেলল। যেমন হাত নেড়ে তারা যদি নাচানাচি করে তাহলে কালাচান ধলাচানও হুবহু তাদের অনুকরণ করে হাত পা নেড়ে নাচানাচি করে। সবচেয়ে মজা হলো যখন মিঠু আনন্দে চিৎকার করে বলল, "হুশ!" আর কালাচানও অবিকল মিঠুর গলার স্বরে বলল, "হুশ!" কাক যে মানুষের গলার অনুকরণ করে শব্দ করতে পারে সেটা তারা কেউ জানত না।

মেয়েটি কিছুক্ষণ নাচানাচি করে হঠাৎ ঘুরে রতনের দিকে তাকিয়ে বলল, "সাইন্টিস্ট চাচ্চু, কালাচান ধলাচানকে আমাদের স্কুলে নিয়ে যেতে পারি? অন্যদের দেখাব!"

রতন একটু থতমত খেয়ে বলল, "তোমাদের স্কুলে নেবে?"

মিঠু মেয়েটিকে থামিয়ে বলল, "ধুর বেকুব! কালাচান আর ধলাচান অনেক স্পেশাল। সারা পৃথিবীতে একটাও নাই! এটা কি খেলনা নাকি যে আমাদের স্কুলে নেব! "

অন্য ছেলেটিও মাথা নাড়ল, বলল, "এইটা কোটি টাকার থেকে বেশি মূল্যবান। তাই না সাইন্টিস্ট চাচ্চু?"

রতনকে এর আগে কেউ সাইন্টিস্ট চাচ্চু ডাকেনি। সে তার নূতন পরিচয়ে বেশ মজা পেল বলে মনে হলো। হাসতে হাসতে মেয়েটিকে বলল, "তোমরা কালাচান ধলাচানকে তোমাদের স্কুলে নিতে চাও?"

মেয়েটি চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ। নিতে চাই।"

"তোমাদের স্কুলের স্যার ম্যাডামরা আপত্তি করবে না? ক্লাশে মানুষের বাচ্চা যাবার কথা, কাকের বাচ্চা গেলে কেমন দেখাবে?"

মিঠু হি হি করে হেসে বলল, "কালাচান ধলাচানের বুদ্ধি আমাদের ক্লাশের অনেক ছেলেমেয়ে থেকে বেশি!"

মেয়েটি বলল, "অনেক স্যার ম্যাডাম থেকে বেশি"

রতন বলল, "সেটা ঠিক আছে, কিন্তু স্কুলে কাকের বাচ্চা নেবে কীভাবে? রাখবে কোথায়?"

মিঠু তো তার ছেলেমানুষি মুখ বড়ো মানুষের মতো গম্ভীর করে বলল, "সাইন্টিস্ট চাচ্চু, আপনি সেটা নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমাদের স্কুলে সায়েন্স ফেয়ার হচ্ছে। সায়েন্স ফেয়ারে সবকিছু নেয়া যায়। এর আগেরবার ক্লাশ নাইনের রত্নাপু একটা গরু নিয়ে এসেছিল।"

"গরু?" রতন অবাক হয়ে জানতে চাইল, "গরু কেন?"

"গরুর হজম প্রক্রিয়া দেখানোর জন্যে।"

রিমি মনে করিয়ে দিল, "সায়েন্স ফেয়ার শেষ হবার পর কতদিন ক্লাশে গোবরের গন্ধ ছিল মনে আছে?"

মিঠু বলল, "সায়েন্স ফেয়ারের সময় কাক গরু ছাগল সবকিছু নিতে দিবে।" তারপর খুব আশা নিয়ে বলল, "দেবেন নিতে?"

রতন বলল, "এক শর্তে দিতে পারি?"

তিনজন একসাথে জিজ্ঞেস করল, "কোন শর্তে?"

"তোমাদের স্কুলের ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কেউ কালাচান ধলাচানের কথা জানতে পারবে না।"

তিনজন একসাথে চিৎকার করে বলল, "জানবে না। খোদার কসম।"

রতন বলল, "খোদার কসম দিতে হবে না, তোমরা কথা দিলেই যথেষ্ট।"

মিঠু হুংকার দিয়ে বলল, "কথা দিলাম।"

"আরো একটা কথা।"

"কী কথা?"

"কোনো সাংবাদিক টেলিভিশন চ্যানেল পত্রিকার ফটোগ্রাফার কেউ যেন এটার কথা জানতে না পারে।"

"জানবে না।" রিমি এবারে হুংকার দিয়ে বলল, "কোনো সাংবাদিকদের আমরা স্কুলেই ঢুকতে দেব না। ঢোকার চেষ্টা করলে ঠ্যাং ভেঙে দেব।"

মানিক একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, "ঠ্যাং শব্দটা অসুন্দর। আর সাংবাদিকতা খুবই মহান পেশা। তাই সাংবাদিকদের সম্পর্কে অসম্মানজনক কথা বলা ঠিক নয়।"

রিমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "আপনি সাংবাদিক?"

"না, আমি ঠিক সাংবাদিক না, তবে আমি সংবাদপত্রে মাঝেমধ্যে লেখালেখি করি।"

"আপনি লেখক?"

মানিক মুখে একটা আলগা গাম্ভীর্য নিয়ে এসে বলল, "আসলে আমি কবি।"

"কবি?" তিনজন একসাথে বিস্ময় প্রকাশ করল। মিঠু বলল, "আসলে আমি কখনো সত্যিকারের কবি দেখি নাই।"

তারপর মানুষ যেরকম করে একটা বিচিত্র প্রাণী দেখে সেভাবে ঘুরে ঘুরে তাকে দেখল। একজন তার আঙুলগুলো টিপে দেখল। দেখা শেষ হবার পর মিঠু বলল, "হুশ!"

রতন বলল, "তাহলে কথা দিচ্ছ তোমরা কোনো সাংবাদিককে কালাচান ধলাচানকে দেখতে দেবে না?"

তিনজন একসাথে বলল, "কথা দিচ্ছি।"

তারা স্পষ্ট শুনল কালাচান আর ধলাচানও বলল, "কথা দিচ্ছি।"

রতন বলল, "ঠিক আছে। তোমরা তোমাদের স্কুলের ঠিকানা দাও। যেদিন সায়েন্স ফেয়ার সেদিন আমি কালাচান ধলাচানকে তোমাদের স্কুলে দিয়ে আসব। দুইদিন পর আবার নিয়ে আসব।"

তিনটি বাচ্চা এত জোরে তাদের মাথা নাড়ল যে মনে হলো মাথা বুঝি তাদের ঘাড় থেকে খুলে আসবে!

বাচ্চাগুলো চলে যাবার পর মানিক বলল, "কাজটা কি ঠিক হলো? এত ছোটো বাচ্চাদের হাতে এত মূল্যবান দুটো কাকের বাচ্চাকে তুলে দিচ্ছ?"

রতন বলল, "এই কাকের বাচ্চা দেখে স্কুলের ছেলেমেয়েরা যদি একটু আনন্দ পায় সমস্যা কী?"

মানিক ফোঁস করে খুব লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কী জন্যে কে জানে!

নির্দিষ্ট দিনে রতন কালাচান আর ধলাচানকে একটা কালো কাপড়ে ঢাকা বড়ো খাঁচার ভিতরে ভরে মিঠুদের স্কুলে গিয়ে তাদের হাতে তুলে দিল। মিঠু তার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে স্কুলের গেটে অপেক্ষা করছিল, তারা মহা উৎসাহ নিয়ে খাঁচাটাকে ভিতরে নিয়ে গেল। রতন সাথে একটা প্যাকেট দিয়ে বলল, "এর ভেতরে কালাচান ধলাচানের খাবার আছে। প্রত্যেক ঘণ্টায় একবার করে দুজনকে দুটো প্যাকেট খাবার আর দুটো ড্রিংকের বোতল দিও।"

মিঠু বলল, "দেব। মরা ইন্দুর দিতে হবে কি না বলেন। মেরে নিয়ে আসব।"

রতন বলল, "না, মরা ইঁদুর লাগবে না। শুধু লক্ষ রেখো সবসময়েই কালাচান ধলাচানের যেন কিছু-একটা করার থাকে। ভিতরে কাগজ কলম আছে। ইলেকট্রনিক গিটার আছে, নানারকম খেলনা আছে, সেগুলো যেন থাকে।"

"থাকবে। ক্রিকেট ব্যাট ফুটবল দিতে হলে—"

"দিতে হবে না। আর যদি কোনো ইমার্জেন্সি হয় আমাকে ফোন করো।"

"করব। আপনার নম্বর আমার মুখস্থ।"

"গুড।" রতন এক মুহূর্ত থেমে বলল, "আর মনে আছে তো? নো সাংবাদিক।"

“মনে আছে। কোনো সাংবাদিক টিভি ক্যামেরা ধারে কাছে আসতে পারবে না। কাছে আসলেই—”

মিঠু হাত দিয়ে গলায় পোচ দেবার ভঙ্গি করল।

কালাচান ধলাচানকে দেখার জন্যে সারা স্কুল ভেঙে পড়ল। যারা নিজেরা নানারকম বিজ্ঞানের প্রজেক্ট নিয়ে এসেছে তার পর্যন্ত তাদের প্রজেক্ট ফেলে রেখে কালাচান ধলাচানকে দেখতে এল। মিঠু দরজার মাঝে তার ভলান্টিয়ার দাঁড় করিয়ে রাখল, ঘরে ঢোকার আগে সবাইকে বুকে হাত দিয়ে বলতে হলো, “আমি খোদার নামে কসম খেয়ে বলছি, এই রুমে যেটি দেখব সেটি কাউকে বলব না। যদি বলি তাহলে জাহান্নামের আগুনে যেন আমি জ্বলে পুড়ে মরি।”

ভেতরে বড়ো খাঁচা, খাঁচার সামনে কাচ এবং তার ভেতর দিয়ে কালাচান ধলাচানকে দেখা যাচ্ছে। তারা সবসময়েই কিছু না কিছু করছে। খাবার সময় তাদের রবোটিক হাত দিয়ে প্যাকেট খুলে কিছু না কিছু খাচ্ছে। সফট ড্রিংকের বোতলের ছিপি খুলে ঢক্‌ঢক্‌ করে ড্রিংকস মুখে ঢেলে দিচ্ছে। কাগজ বিছিয়ে তার ওপর রঙিন কলম দিয়ে ছবি আঁকছে। একটা গিটার আছে সেটা বাজাচ্ছে। কখনো কখনো দুজনে আবার ধাক্কাধাক্কি করছে, মনে হয় এটা তাদের এক ধরনের খেলা।

স্কুলের ছেলেমেয়েরা ভিড় করে কালাচান ধলাচানকে দেখছে। এত ছেলেমেয়ে দেখে প্রথম প্রথম কালাচান ধলাচান একটু ভড়কে গিয়েছিল কিন্তু বেশ তাড়াতাড়ি তারা ব্যাপারটা মেনে নিল। শুধু যে মেনে নিল তাই না ছেলেমেয়েরা কিছু-একটা বললে সেটা তারা অবিকলভাবে বলারও চেষ্টা করতে লাগল।

ছেলেমেয়েদের এই প্রচণ্ড ভিড় দেখে মিঠু মহাখুশি, অহংকারে তার মাটিতে পা পড়ে না এরকম অবস্থা। যেই আসছে তাকেই সে বলছে, “বুঝলি, এই যে দুইটা ফাটাফাটি কাক দেখছিস সেগুলি কে দিয়েছে জানিস? আমি (এই সময় সে তার বুকে একটা থাবা দেয়!)। কাক দুইটার হাত কে লাগিয়েছে জানিস? (সবাই উৎসুক হয়ে শোনার জন্যে তাকায়

তখন সে ঘাড় বাঁকা করে বলে) পৃথিবীর কেউ সেটা জানে না। টপ সিক্রেট প্রজেক্ট।"

বাচ্চারা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে, তাদের নানারকম প্রশ্ন থাকে এবং মিঠু বানিয়ে বানিয়ে তার উত্তর দিতে থাকে। কাকের হাত লাগানোর পর এই টপ সিক্রেট সায়েন্টিস্ট মানুষের পাখা লাগানোর একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ শুরু করবে এই ধরনের একটা খবর সে ঘোষণা করে দিল। পানির নীচে নিশ্বাস নিতে পারে এই রকম একটা মেয়ে তৈরি করা হয়ে গেছে এই খবরটাও সে ছড়িয়ে দিল। কপালের উপর তিন নম্বর একটা চোখ লাগানোরও একটা গোপন প্রজেক্ট আছে সেটা সে খুবই গোপনে শুধু অল্প কয়েকজনকে বলল।

স্কুলের ছেলেমেয়েরা টপ সিক্রেট প্রজেক্টের কথা শুনে বিদায় নিলেও স্যার ম্যাডামরা তাকে এত সহজে ছাড়লেন না। কালাচান ধলাচান কোথা থেকে এসেছে কে তৈরি করেছে তাদের এরকম অসংখ্য প্রশ্ন। মিঠু অবশ্যি মুখ শক্ত করে জানাল, "এটা বলার পারমিশন নাই।" স্যার ম্যাডামরা তাকে ধমকাধমকি করলেন কিন্তু মিঠু মুখ খুলল না।

বিকেলবেলা যখন সায়েন্স ফেয়ার শেষ হয়েছে তখন কালাচান ধলাচানের খাঁচাটা কালো কাপড়টা দিয়ে ঢেকে দিল। স্কুলের দপ্তরিটা যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ঘরটাতে তালা না মারল মিঠু সামনে থেকে নড়ল না। দপ্তরি চলে যাবার পর মিঠু ঘরের দরজার মাঝে আরো একটা তালা লাগিয়ে দিল, বুদ্ধি করে বাসা থেকে সে আরেকটা তালা নিয়ে এসেছে। সায়েন্টিস্ট চাচ্চুকে সে কথা দিয়েছে কালাচান ধলাচানকে সে দেখেশুনে রাখবে।

মিঠু আর তার দলের ছেলেমেয়েরা ভেবেছিল পরের দিন বুঝি ভিড় কম হবে, কিন্তু দেখা গেল ছেলেমেয়েদের উৎসাহের কোনো কমতি নেই। পরের দিন ভিড় আরো বেশি। দরজায় পাহারা বসানো হয়েছে যেন কোনো সাংবাদিক চলে আসতে না পারে। সায়েন্টিস্ট চাচ্চুকে কথা দিয়েছে কোনোভাবেই কোনো সাংবাদিক যেন খবর না পায় তাই তারা খুবই সতর্ক। যদিও তারা মোটেও বুঝতে পারছে না কেন সাংবাদিকদের এটা

দেখানো যাবে না। তারা বরং এতদিন উলটোটাই জেনে এসেছে যা কিছু সম্ভব সাংবাদিকদের জানাতে হবে।

গেটে যখন ভলান্টিয়ারদের ধাক্কাধাক্কি করে ছেলেমেয়েরা কালাচান ধলাচানকে দেখতে আসছে তখন মিঠু সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। পাশে রিমি দাঁড়িয়েছিল, তাকে বলল, "বুঝলি রিমি, একটা ভুল হয়ে গেছে।"

"কী ভুল?"

"দুই টাকা করে টিকেট ধরা উচিত ছিল। তাহলে একদিনে বড়োলোক হয়ে যেতাম।"

"পাঁচ টাকা করে টিকেট ধরে রাস্তার পাবলিককে ডেকে আন, আরো তাড়াতাড়ি আরো বড়োলোক হয়ে যাবি।"

"সাংবাদিকদের ডেকে আনলে তো আরো বেশি টাকা বানাতে পারতাম।"

ঠিক এইরকম সময় গেটের ভলান্টিয়ারদের ধাক্কা দিয়ে গুল্লু ভিতরে ছুটে এল, হাঁপাতে হাঁপাতে চিৎকার করে বলল, "সর্বনাশ হয়েছে।"

মিঠু চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, "সাংবাদিক?"

"হ্যাঁ। এই এত বড়ো বড়ো ক্যামেরা!"

"তুই নিজে দেখেছিস?"

"হ্যাঁ।" গুল্লু বলল, "হেডস্যারের রুমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম হঠাৎ শুনলাম ভিতরে টেলিভিশন চ্যানেলের কথা বলছে। তখন দাঁড়িয়ে ভিতরের কথা শোনার চেষ্ট করেছি।"

"কী শুনেছিস?"

একজন হেডস্যারকে জিজ্ঞেস করছে, "আপনার স্কুলে নাকি দুইটা কাক আছে যার দুইটা করে হাত, সেই হাত দিয়ে নাকি সবকিছু করতে পারে, ছবি আঁকতে পারে, ড্রিংক খেতে পারে?"

"সর্বনাশ! কেমন করে খবর পেল?"

"কোনো ছেলে না হলে মেয়ে বাসায় গিয়ে বলে দিয়েছে।"

মিঠু দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "খুন করে ফেলব আমি।"

রিমি বলল, “খুন করার অনেক সময় পাবি, আগে সাংবাদিকদের কীভাবে ঠেকাবি সেটা ঠিক কর।”

গুল্লু বলল, “মারপিট না করে ঠেকানো যাবে না। হেডস্যার টেলিভিশনের ক্যামেরা দেখে মহাখুশি। এক্ষুনি নিয়ে আসবে।”

মিঠু নাক দিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, “হুশ!”

গুল্লু বলল, “কী করব বল। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ল্যাং দিয়ে ফেলে দেব? হেডস্যার সাথে থাকলে সমস্যা।”

মিঠু কয়েক সেকেন্ড কিছু-একটা চিন্তা করল, তারপর গুল্লুকে বলল, “তুই যা, সাংবাদিকদের কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখ।”

“কীভাবে ঠেকিয়ে রাখব, ভয় দেখিয়ে? চাকু আছে কারো কাছে?”

রিমি বলল, “না না চাকু ফাকু দিয়ে হবে না। তুই সাংবাদিকদের ভুল জায়গায় নিয়ে যা—ভুলিয়ে ভালিয়ে দেরি করিয়ে দে।”

“তোরা কী করবি?”

“এই সময়ের মাঝে কালাচান ধলাচানকে সরিয়ে ফেলব।”

“পারবি?”

“পারতে হবে।”

মিঠু গলা উঁচিয়ে ভলান্টিয়ারদের বলল, “তোরা এখন কাউকে ভিতরে ঢুকতে দিবি না।”

দরজায় দাড়ানো ছেলেমেয়েরা আপত্তি করল, “কেন ঢুকতে পারব না?”

মিঠু বলল, “কালাচান ধলাচানকে ভিটামিন খাওয়াতে হবে। দিনে একবার ভিটামিন ওয়াই এক্স খাওয়াতে হয়।”

রিমি নীচু গলায় বলল, “ভিটামিন ওয়াই এক্স নাই গাধা।”

মিঠু ফিস ফিস করে বলল, “না থাকলে তোর সমস্যা কী?”

ছেলেমেয়েদের মিঠুর কথা শোনার কোনো আগ্রহ ছিল না, কিন্তু ভলান্টিয়াররা তাদের ঠেলে বের করে দিল। ঘরটা খালি হওয়ার সাথে সাথে মিঠু বলল, “রিমি, তোর ব্যাকপ্যাকটা কই?”

রিমি টেবিলের তলা থেকে তার ব্যাকপ্যাকটা বের করে দেয়, “এই যে।”

"খালি কর।"

"খালি করব?" রিমি আপত্তি করল, "আমার সব দরকারি জিনিস খাতাপত্র—"

"তোর দরকারি জিনিস খাতাপত্রের খেতাপুড়ি। হুশ! খালি করে সবকিছু টেবিলের নীচে রাখ।"

রিমি তার ব্যাকপ্যাক খালি করে খাতাপত্র টেবিলের নীচে রাখল। মিঠু তখন সাবধানে খাচার ভেতর থেকে কালাচান ধলাচানকে বের করে ব্যাকপ্যাকের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলল। কাক দুটো একটু আপত্তি করল, একটু ডানা ঝাপটালো কিন্তু মিঠু সেগুলো নিয়ে মাথা ঘামাল না। ব্যাকপ্যাকের জিপ টেনে বন্ধ করার পর কালাচান ধলাচান একটু শান্ত হয়ে যায়।

রিমি বলল, "খাঁচা খালি দেখেই বুঝে যাবে।"

মিঠু দুই এক সেকেন্ড কিছু-একটা চিন্তা করে কালো কাপড়টা দিয়ে খাঁচাটা ঢেকে দিয়ে বলল, "বলতে হবে এখন কালাচান ধলাচান রেস্ট নিচ্ছে।"

রিমি বলল, "কিন্তু ক্যামেরার লোকজন তোর কথা শুনবে না। টান দিয়ে এই কাপড় খুলে ফেলবে..."

মিঠু বলল, "হুশ! ভিতরে কিছু-একটা রাখতে হবে। ক্যামেরার লোকজনের যেন বুঝতে সময় লাগে।"

"কী রাখবি?"

মিঠু মাথা চুলকাচ্ছিল, তখন রিমি বলল, "দুই তালায় ক্লাশ নাইনের ইনকিউবেটর প্রজেক্ট আছে। সেইখানে দুইটা মুরগি আছে।"

"মুরগি?"

"হ্যাঁ।"

"কালো?"

"কালো কি না মনে নাই। যে রঙেরই হোক, সমস্যা কী?"

"কোনো সমস্যা নাই। তুই আনতে পারবি?"

"দেখি চেষ্টা করে।" বলে রিমি বের হয়ে গেল।

মিঠু খালি ঘরটার মাঝে একটু অস্থির হয়ে হাঁটে, গুল্লু সাংবাদিকদের বুদ্ধি করে আটকে রাখতে পেরেছে কি না কে জানে!

গুল্লু ঠিকই সাংবাদিকদের আটকে রেখেছিল, সিঁড়ির গোড়ায় সে সাংবাদিকদের ধরল, চোখে-মুখে একটা আনন্দের ভাব করে বলল, "আপনারা এসেছেন? কতক্ষণ থেকে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছি। আসেন আমার সাথে—"

সাংবাদিকেরা একটু থতমত খেয়ে গেল, গুল্লু তখন তাদের হাত ধরে টেনে নিতে থাকে। একটা ঘরের ভিতরে ঢুকে ছেলেমেয়েদের বলল, "এই যে দেখ! টেলিভিশনের লোকজন চলে এসেছে আমাদের প্রজেক্ট দেখতে।"

টেলিভিশন ক্যামেরার সাথে আরেকজন মানুষ, হাতে মাইক্রোফোন, সে ইতস্তত করে বলল, "আমরা এসেছি কাক—"

গুল্লু বলল, "কী বলছেন, কাক! এই প্রজেক্ট দেখেন এইখানে শুধু কাক না, চিল শকুন সব আছে!" গুল্লু এক নজর প্রজেক্টটা দেখে নেয়, পরিবেশবান্ধব নগরের পরিকল্পনা—তারপর ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলল, "ভিডিও শুরু করেন। আমি বলি—এইটা হচ্ছে পরিবেশবান্ধব নগর। মানুষের যেরকম বন্ধু-বান্ধব থাকে, শহরেরও বন্ধু-বান্ধব থাকে পরিবেশেরও বন্ধু-বান্ধব থাকে। পরিবেশের বন্ধু-বান্ধব কারা? আমরা! তার কারণ আমরা কোনোরকম কালো ধোঁয়া ছাড়া ইলেকট্রিসিটি বানাতে পারি। সামনে একটা টারবাইন থাকবে আর আমরা একসাথে হাঁচি দেব। হাঁচির বাতাসে টারবাইন ঘুরবে ইলেকট্রিসিটি তৈরি হবে—"

ক্যামেরা হাতে মানুষটা গুল্লুর কথা শুনে হকচকিয়ে গেল। মাইক্রোফোন হাতে মানুষটা বলল, "আমরা এই প্রজেক্ট ভিডিও করতে আসি নাই। দুইটা নাকি কাক আছে যারা হাত দিয়ে ছবি আঁকতে পারে?"

গুল্লু থামিয়ে দিয়ে বলল, "কেন? আমাদের প্রজেক্ট পছন্দ হয় না? আমরা কি রাস্তা থেকে এসেছি? আমাদের প্রজেক্ট কি ফালতু প্রজেক্ট?"

"না, না, ফালতু কেন হবে?"

"তাহলে কেন ভিডিও করছেন না?" গুল্লু তখন ছাত্রছাত্রীদেরকে বলল,

"তোরা দরজাটা বন্ধ করে দে। আমাদের সব কয়টা প্রজেক্ট ভিডিও না করে কেমন করে যায় আজকে দেখে নেব।"

সাংবাদিকদের মুখ একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল, এবং চারিদিক এক নজর দেখে তারা দ্রুত ভিডিও করতে শুরু করল।

এদিকে রিমি ক্লাশ নাইনের ইনকিউবেটর প্রজেক্ট থেকে দুটি মুরগির বাচ্চা নিয়ে এসেছে, একটা কালো আরেকটা লালচে। মিঠু দুটো স্ট্র নিয়ে এসেছে, মাঝখানে কেটে চার টুকরো করে সেগুলো রাবার ব্যান্ড দিয়ে মুরগির ডানার সাথে লাগিয়ে দিল। তারপর ড্রয়িং বোর্ডে ছোটো ছোটো হাত এঁকে সেটা স্ট্রয়ের মাথায় স্বচ্ছ টেপ দিয়ে লাগিয়ে নিল। বিষয়টা খুবই হাস্যকর কিন্তু সাংবাদিকদের কিছুক্ষণ নিশ্চয়ই বিভ্রান্ত করে রাখা যাবে।

মুরগি দুটো তাদের এই বিচিত্র হাত দুটো মোটেও পছন্দ করল না এবং খুবই বিরক্ত হয়ে ঠোঁট দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খুলে ফেলার চেষ্টা করতে থাকে। মিঠু আর রিমি মিলে কালো কাপড় দিয়ে আবার ভালো করে খাঁচাটা ঢেকে রাখল।

মিঠু তখন রিমির ব্যাকপ্যাকটা তার হাতে তুলে দিয়ে বলল, "নে, তুই এটা নিয়ে বের হয়ে যা। সাইন্টিস্ট চাচ্চুর বাসার দিকে হাঁটতে থাক। আস্তে আস্তে হাঁটিস।"

রিমি জিজ্ঞেস করল, "তোরা আসবি না আমার সাথে?"

"আসব। সাংবাদিকেরা যখন কালাচান ধলাচানের ভিডিও করতে গিয়ে মুরগির ভিডিও করে ফেলবে তখন তাদের মুখের অবস্থাটা কী হয় দেখতে চাই।"

"আমিও দেখতে চাই।"

মিঠু মাথা নাড়ল, "না, না, তোর দেখতে হবে না। তা হলে দেরি হয়ে যাবে—যদি বুঝে যায় তোর ব্যাকপ্যাকে কালাচান ধলাচান তাহলে মুশকিল হবে।"

রিমি তখন এত বড়ো মজার দৃশ্যটা নিজের চোখে দেখবে না বলে একটু হতাশ হয়ে তার ব্যাকপ্যাকটা ঘাড়ে ঝুলিয়ে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

ঠিক তখন দরজা খুলে সাংবাদিকেরা ভিতরে ঢুকে পড়ল—তাদের সাথে গুল্লুও আছে। গুল্লু বলল, "মিঠু, এই যে এদের কথা বলছিলাম, কালাচান ধলাচানের ভিডিও করতে এসেছে।"

রিমি তাদের পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সাংবাদিকেরা চোখ সরু করে রিমিকে সন্দেহের চোখে একবার দেখল কিন্তু কিছু বলল না। মিঠু গুল্লুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ভিডিও করার পারমিশন কে দিয়েছে? তুই?"

গুল্লু বলল, "আমি দেই নাই। এরা জোর করে চলে এসেছে।"

মিঠু বলল, "তুই জানিস না, আমরা সাইন্টিস্ট চাচ্চুকে কথা দিয়েছি কোনো সাংবাদিককে এটা দেখতে দেব না?"

গুল্লু হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, বলল, "আমি বলেছি। আমি অন্য সব প্রজেক্টে নিয়ে গেছি কোনোটার ভিডিও করতে চায় না। শুধু এইটা ভিডিও করবে।"

মিঠু এই প্রথমবার সাংবাদিকদের দিকে তাকালো, বলল, "হুশ!"

দুইজন সাংবাদিক, মাইক্রোফোন হাতে মানুষটা ফর্সা, ক্যামেরা ঘাড়ে মানুষটা কালো। ফর্সা মানুষটা একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "কী বললে?"

মিঠু বলল, "কিছু বলি নাই। বলতে চাচ্ছি যে কালাচান ধলাচানকে ভিডিও করা যাবে না। আমরা করতে দিব না, আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দেখার জন্যে সাইন্টিস্ট চাচ্চু আমাদেরকে দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন কোনোভাবে যেন সাংবাদিকেরা না দেখে।"

ফর্সা মানুষটা বলল, "শোনো ছেলে, এই স্কুল থেকে আমাদের কাছে চিঠি গেছে, এইখানে সায়েন্স ফেয়ার হবে সেটা কাভার করার জন্য। আমরা কাভার করতে এসেছি, আমাদের ভিডিও করতে করতে দেবে না মানে? ফাজলেমি পেয়েছ?"

"আমাদের স্কুল থেকে প্রত্যেক বছর চিঠি পাঠানো হয়, কোনো বছর কোনো সাংবাদিক আসে না, এই বছর চলে এসেছেন, ব্যাপারটা কী?"

মাইক্রোফোন হাতে ফর্সা মানুষটা খুবই বিরক্ত হলো, তার মুখটা কেমন যেন বিকৃত হয়ে গেল। মুখ খিঁচিয়ে বলল, "সেই কৈফিয়ত আমার তোমাকে দিতে হবে? পুঁচকে ছোঁড়া তোমার সাহস বেশি হয়েছে?"

মিঠু শীতল চোখে মানুষটার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমার এই একটাই সমস্যা—সাহস বেশি।"

ফর্সা মানুষটা ক্যামেরা হাতে কালো মানুষটাকে বলল, "ক্যামেরাটা রাখ, রেখে দরজা বন্ধ কর।"

ক্যামেরা হাতে মানুষটা বলল, "ওকে বস।" তারপর ক্যামেরাটা টেবিলে রেখে দরজাটা বন্ধ করল।

মাইক্রোফোন হাতে ফর্সা মানুষটা তার মাইক্রোফোনটা ক্যামেরার পাশে রেখে শার্টটা উপরে তুলল, মিঠু আর গুল্লু চমকে উঠে দেখল, প্যান্টে একটা রিভলভার গুঁজে রাখা আছে। ফর্সা মানুষটা হিসহিস করে বলল, "এখন বুঝছিস আমরা কারা? আমরা তোর কাউয়ার ছবি তুলতে আসি নাই—তোর কাউয়ারে নিয়া যাইতে আইছি।"

ফর্সা মানুষটা যতক্ষণ সাংবাদিক হওয়ার ভান করেছে ততক্ষণ শুদ্ধ ভাষায় কথা বলেছে, এখন খারাপ ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছে। তাদের তুই তুই করে বলছে। মিঠু চুপচাপ থাকার চেষ্টা করল কিন্তু তার মুখ থেকে বের হয়ে এল, "হুশ!"

"কী বললি?"

মিঠু মাথা নাড়ল, "কিছু বলি নাই। হুশ!"

কালো মানুষটা বলল, "বাদ দেন বস। আমাগো কাম আমরা করি।"

ফর্সা মানুষটা বলল, "কালা কাপড়টা তুল, কোটি টাকার কাউয়ারে দেখি।"

গুল্লু চমকে উঠে বলল, "কোটি টাকা?"

"হ। তোগো কাউয়ার খবর সারা দুনিয়াতে জানাজানি হইছে। বিদেশিগো সাথে আমাগো কোটি টাকার কন্ট্রাক্ট।"

গুল্লু বলল, "কেমন করে জানাজানি হলো?"

"এই খবর চাপা থাকে না।"

কালো মানুষটা খাঁচার কাছে গিয়ে কালো কাপড়টা তুলে একটু উঁকি দিয়ে সন্তুষ্টির মতো শব্দ করল। ফর্সা মানুষটা জিজ্ঞেস করল, "আছে?"

"আছে বস। দুইটা। একটা কালা আরেকটা লাল।"

"লাল?" ফর্সা মানুষটা অবাক হয়ে বলল, "কাউয়া লাল হয় কেমন করে?"

"তাইতো।" কালো মানুষটা এবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে টান দিয়ে কালো কাপড়টা সরিয়ে দিতেই মুরগি দুটো কঁককঁক শব্দ করে দাঁড়িয়ে গেল। মাথা নাড়িয়ে সবাইকে দেখল।

ফর্সা মানুষটার মুখটা হঠাৎ কেমন যেন বিকৃত হয়ে যায়, দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "কাউয়া দুইটা কই?"

মিঠু অবাক হয়ে বলল, "কাক? কাক নেই, আমাদের কাছে এই দুটোই আছে। কালোটার নাম কালাচান আর লালটার নাম ধলাচান। আমরা এই দুটোই দেখাচ্ছি।"

কালো মানুষটা বলল, "বস। ঠিকই আছে। দেখছেন না হাত আছে। মনে হয় মুরগিরে ভুল করে কাউয়া বলেছে।"

ফর্সা মানুষটা চিৎকার করে বলল, "ঠিক নাই। আমি ছবি দেখেছি। মুরগি ছিল না, কাক ছিল। আর দেখছিস না প্লাস্টিকের স্ট্র দিয়ে হাত বানাইছে? রাবার ব্যান্ড দিয়ে মুরগির ডানার সাথে লাগাইছে?"

কালো মানুষটা বলল, "তাইতো!"

তারপর দুজনেই মিঠু আর গুল্লুর দিকে তাকাল। ফর্সা মানুষটা তার কোমরে গোঁজা রিভলভারটা টান দিয়ে বের করে মিঠুর মাথায় ধরল, বলল, "কাউয়া দুইটা কই?"

মিঠু বলল, "হুশ!"

"খুন করে ফেলব আমি।"

মিঠু বলল, "এত সোজা না। এই স্কুলে এক হাজার ছেলে মেয়ে থাকে। আমারে খুন করে বের হবার চেষ্টা করলে সবাই ছাতু করে ফেলবে। হুশ!"

কথাটায় যুক্তি আছে। ফর্সা মানুষটা বলল, "ঠিক আছে তাহলে।" তারপর রিভলভারটা প্যান্টে গুঁজে মিঠুর হাত ধরে ঘুরিয়ে এমনভাবে মোচড় দিল যে যন্ত্রণায় তার চোখে পানি এসে গেল। ফর্সা মানুষটা বলল, "বল, কাউয়া দুইটা কই? বল!"

মিঠু যন্ত্রণায় ছটফট করে বলল, "হুশ!"

"বল। বল এক্ষুনি।"

"হুশ! হুশ!"

"বল বলছি। নাহলে হাত খুলে আসবে।"

কথাটা সত্যি তাই মিঠু বলল, "ঠিক আছে বলছি। আগে হাতটা ছাড়।"

ফর্সা মানুষটা হাতটা ছেড়ে বলল, "বল কাউয়া দুইটা কই?"

"সাইন্টিস্ট চাচ্চুর কাছে ফেরত পাঠিয়েছি।"

"কেমন করে ফেরত পাঠালি? কখন ফেরত পাঠালি?"

"রিমির ব্যাকপ্যাকে করে, তোমাদের সামনে বের হয়ে গেল মনে নাই!"

"ঐ মেয়েটা? তখনই মনে হলো মেয়েটার কোনো বদ মতলব আছে।"

মিঠু বিড়বিড় করে বলল, "মেয়েটার কোনো বদ মতলব নাই। বদ মতলব তোমাদের।"

"কী বললি?"

"কিছু বলি নাই। হুশ!"

কালো মানুষটা বলল, "ঐ ছেমড়ি বেশি দূর যাবার পারে নাই। কোনদিকে গেছে?"

ফর্সা মানুষটা বলল, "আমাদের নিয়া চল। এক্ষুনি।"

মিঠু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমাকে আগে সাইন্টিস্ট চাচ্চুর সাথে কথা বলতে হবে।"

"তোর মাথা খারাপ হইছে।"

মিঠু বলল, "হয় নাই। কথা বলতে হবে।"

ফর্সা মানুষটা বলল, "ঠিক আছে। কথা বল।" সে তার পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে মিঠুর হাতে দিল। তারপর আবার রিভলভারটা বের করে তার মাথায় ধরল।

মিঠু রতনকে ফোন করল, দুবার রিং হতেই রতন ফোন ধরল, "হ্যালো।"

"আমি মিঠু।"

"কোনো সমস্যা?"

"জি, অনেক বড়ো সমস্যা।"

"কোনো মানুষ কালাচান আর ধলাচানের জন্যে তোমাদের ভয় ভীতি দেখাচ্ছে? তোমাদের কোনো ধরনের বিপদ? ডেঞ্জার?"

রতন কেমন করে বুঝে গেল মিঠু বুঝতে পারল না। সে বলল, "জি সাইন্টিস্ট চাচ্চু।"

"তাকে কিংবা তাদেরকে দিয়ে দাও। এক্ষুনি দিয়ে দাও। তোমাদের যেন কোনো বিপদ না হয়।"

"আপনার এত মূল্যবান কালাচান ধলাচান।"

"আমার যেটা জানার ছিল জেনে গেছি—এর মূল্য আমি পেয়ে গেছি। তুমি যদি কাকের বাচ্চা এনে দাও তাহলে দরকার হলে আমি আবার কালাচান ধলাচান বানাতে পারব। বুঝেছ? আমি চাই না কালাচান ধলাচানের জন্যে তোমাদের কোনো ঝামেলা হয়। এক্ষুনি দিয়ে দাও, দিয়ে আমাকে ফোন কর।"

"দিতে একটু সময় লাগছে। দিয়ে আপনাকে ফোন করব।"

"ঠিক আছে।"

মিঠু টেলিফোনটা ফর্সা মানুষটার কাছে ফেরত দিয়ে বলল, "হুশ।"

"কী বললি?"

"বলেছি, চল আমার সাথে, গুল্লু, তুইও আয়।"

ফর্সা মানুষটা তার টেলিফোনটা হাতে নিয়ে কোনো একটা নম্বর ডায়াল করল, তারপর বলল, "জগু, কী বলি মন দিয়া শোন। আমরা এখন এই আভাবাচ্চার স্কুল থেকে বের হইতাছি। ডেরাইভারকে বল রেডি

থাকতে, আর তুই গাড়ি থেকে নাম, একটা মেয়ে পিঠে একটা ব্যাকপ্যাক নিয়ে বের হয়েছে একটু আগে—"

"জে দেখেছি। লাল ব্যাগ।"

"হ্যা, এই মেয়েটারে রাস্তায় খুঁজে বের কর। মেয়েটারে কিছু বলবি না। খালি চোখে চোখে রাখবি।"

"ঠিক আছে।"

ফর্সা মানুষটা টেলিফোনটা রেখে বলল, "চল, যাই। কোনো রকম ঝামেলা করবি না তাহলে কিন্তু ঐ মেয়ে খরচা হয়ে যাবে।"

মিঠু বলল, "হুশ।"

কালো মানুষটা আবার ক্যামেরা ঘাড়ে তুলে নিল, তারপর দরজা খুলে বের হয়ে এল। দরজা খুলতেই বেশ কয়েকজন ছেলেমেয়ে ছুটে এল, একজন জিজ্ঞেস করল, "ভিডিও হয়েছে?"

ফর্সা মানুষটা বলল, "একটা পার্ট শেষ হয়েছে, এখন অন্য পার্টটা ভিডিও করার জন্যে যাচ্ছি।" তারপর মিঠুর দিকে তাকিয়ে মধুরভাবে হেসে বলল, "এসো খোকা।"

বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন ভলান্টিয়ার জিজ্ঞেস করল, "এখন ছাত্রছাত্রীদের ঢুকতে দেব?"

মিঠু বলল, "এখন না দেওয়াই ভালো। কালাচান আর ধলাচানের একটু বিশ্রাম দরকার।"

ফর্সা মানুষটা মিঠুকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ দিল না, প্রায় একটা ধাক্কা দিয়েই বাইরের দিকে নিয়ে যায়।

স্কুলের বাইরে একটা মাইক্রোবাস দাঁড়িয়েছিল, মিঠু আর গুল্লুকে ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে ফর্সা আর কালো মানুষটাও ভেতরে ঢুকল। মিঠুকে জিজ্ঞেস করল, "কোনদিকে যাব?"

"সোজা।"

ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে সোজা যেতে থাকে। রিমি আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছিল তাই কিছুক্ষণের ভিতরেই তাকে পাওয়া গেল। এদিক সেদিক দেখতে দেখতে রিমি সাবধানে হেঁটে যাচ্ছে। মিঠু বলল, "ঐ যে রিমি। গাড়ি থামাও।"

মাইক্রোবাসটা রিমির কাছে থামল, রিমি একটু অবাক হয়ে তাকাল, মাইক্রোবাসের ভেতরে মিঠু গুল্লু আর সাংবাদিকদের দেখে সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

মিঠু গাড়ি থেকে নেমে বলল, "কিছু হয় নাই।"

"তোর সাথে এরা কেন?"

অন্যরাও ততক্ষণে নেমে এসেছে, জগু নামের মানুষটাও হঠাৎ কোথা থেকে হাজির হয়ে সবাই মিলে রিমিকে ঘিরে ফেলেছে। রিমি এবারে একটু ভয় পেয়ে গেল। মিঠু বলল, "কোনো ভয় নাই। তোর ব্যাকপ্যাকটা দে।"

"কেন?"

"এখন প্রশ্ন করিস না। পরে বলব। তুই ব্যাকপ্যাকটা দে।"

"না, আমি দেব না।"

ফর্সা মানুষটা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "তোমার বাবা দেবে।"

রিমি বলল, "সাহস থাকলে নেয়ার চেষ্টা করেন।"

মিঠু বলল, "মাথা গরম করিস না। এর মাঝে অনেক ব্যাপার আছে। ব্যাগটা দে।"

"না।"

মিঠু তখন রিমির পিছনে গিয়ে ব্যাগটা খুলে নেয়ার চেষ্ট করল। কেউ বুঝতে পারল না যে আসলে সে মোটেই ব্যাগটা খুলে নেয়ার চেষ্টা করল না, সে হুটোপুটি করে ব্যাকপ্যাকের জিপটা টেনে ব্যাগটা খুলে দিল। ব্যাগের ভিতরে একটুখানি জায়গায় এতক্ষণ আটকে থেকে কালাচান ধলাচান নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল, ব্যাগটা খুলতেই দুইজন উড়ে বের হয়ে গেল।

ফর্সা মানুষটা একেবারে পাগলের মতো হা হা করে ছুটে এসে কালাচান ধলাচানকে ধরা চেষ্টা করল, কিন্তু ততক্ষণে দুজনেই নাগালের বাইরে চলে গেছে। কালাচান ধলাচান বেশি দূরে গেল না, তাদের মাথার উপর উড়তে লাগল।

মিঠু চিৎকার করে বলল, "পিচিক।"

কালাচান ধলাচান নিশ্চয়ই বুঝে গেল যে কোনো জায়গায় পিচিক করলে হবে না, তাই খুব হিসাব করে নিখুঁতভাবে ফর্সার মুখের উপর পিচিক করে বাথরুম করে দিল। প্রথমে ধলাচান, তারপরে কালাচান।

ফর্সা লোকটা হাত দিয়ে মুখ ঢাকার চেষ্টা করে, কোন লাভ হয় না, তার চোখের মাঝেও কাকের বাথরুম ঢুকে গেছে, ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না। গুল্লু আর রিমিও তখন চিৎকার করে বলল, "পিচিক পিচিক।"

কালাচান ধলাচান তাদের নিরাশ করল না। বোম্বার প্লেনের মতো উড়ে উড়ে মানুষগুলোর চোখে-মুখে বাথরুম করে যেতে লাগল। সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখার জন্যে মানুষের ভিড় জমে যায় এবং প্রত্যেকবার সফলভাবে বাথরুম করা মাত্র তারা হাততালি দিতে থাকে।

ফর্সা মানুষটা কোনোভাবে চোখ খুলে মিঠুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই ছেড়ে দিলি? তোর মনে এই ছিল আগে বললি না কেন? তোকেও না হয় কোটি টাকার ভাগ দিতাম।"

মিঠু বলল, "তোমার কোটি টাকার ভাগে আমি পিচিক করে দেই।"

কালাচান ধলাচানের বাথরুম সাপ্লাই শেষ হবার পর তারা তাদের মাথার উপর কয়েকপাক উড়ে একটা ইলেকট্রিক তারের উপর বসল, তারপর উড়ে গেল।

কালাচান আর ধলাচানকে আর দেখা যায়নি। রতন বলেছে ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলে হাত দুটো অচল হয়ে যাবে তখন সেগুলো কালাচান ধলাচানের জন্যে একটা বাড়তি ঝামেলা হয়ে দাঁড়াবে। রতন অবশ্যি নিশ্চিত ছিল কালাচান ধলাচান তখন ঠুকরে ঠুকরে সেগুলো খুলে ফেলতে পারবে। হাত ছাড়াই তখন তাদের কাক জগতে বেঁচে থাকা শিখতে হবে। রতনের ধারণা এটা বড়ো কোনো সমস্যা হবে না, কারণ কাক হচ্ছে পাখিদের আইনস্টাইন!

বহুদিন পর রতন একদিন বিজয় সরণি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তখন হঠাৎ কোথা থেকে একটা কাক কা কা করে ডাকতে ডাকতে তার মাথার উপর

উড়তে লাগল। রতন তখন হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে ডাকল, "কালাচান? ধলাচান?"

কাকটা তখন উড়ে তার হাতের উপর বসল। রতন চিনতে পারে, এটা ধলাচান। আরো বড়ো হয়েছে আরো তেজি হয়েছে। সাথে আরো কয়েকটা কাক ছিল তারা অবশ্যি রতনের কাছে এল না, দূরে দূরে উড়ে উড়ে কা কা করে ডাকতে লাগল।

রতন বলল, "ধলাচান, তুমি ভালো আছ?"

ধলাচান বলল, "কা কা।"

"কালাচান কোথায়?"

ধলাচান বলল, "কা কা।"

"ঐ যারা উড়ছে তারা বুঝি তোমার ফেমিলি? বাচ্চা-কাচ্চা?"

ধলাচান বলল, "কা কা।"

রতন সাবধানে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "যাও ধলাচান, বাচ্চা-কাচ্চাকে দেখে শুনে রেখো। যেখানেই থাকো ভালো থেকো।"

ধলাচান বলল, "কা কা" তারপর উড়ে গেল।

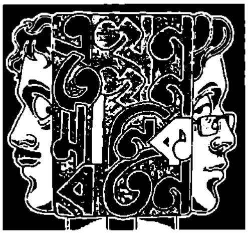

চেয়ার

রতন বেশ মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে। টেবিলের অন্য পাশে বসে থাকা মানিক তার প্লেটের খাবার নাড়াচাড়া করছে। রতন হঠাৎ করে মানিকের দিকে তাকাল, তারপর জিজ্ঞেস করল, "কী হলো মানিক? তুমি খাচ্ছ না?"

মানিক বলল, "চেষ্টা করছি।"

রতন ভুরু কুঁচকে বলল, "কোনো সমস্যা?"

মানিক বলল, "না মানে ইয়ে, কে রেঁধেছে?"

রতন বলল, "কে রেঁধেছে মানে? অবশ্যই আমি রেঁধেছি।"

মানিক বলল, "এই প্রথম?"

"কেন? প্রথম কেন হবে? আমি প্রত্যেক দিন রাঁধি।"

মানিক ইতস্তত করে বলল, "তুমি বৈজ্ঞানিক মানুষ। বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক গবেষণা করবে। রান্না-বান্না করে সময় নষ্ট করো কেন?"

রতন বলল, "আমার রান্না করতে মোটেও সময় নষ্ট হয় না।"

"সময় নষ্ট হয় না?"

"না।"

'কেন?"

"রান্না করার জন্য আমার রান্না করার যন্ত্রে শুধু ডায়ালটা ঘুরিয়ে সুইচটা টিপতে হয়।" যেমন এই যে গরুর গোশতটা তুমি খাচ্ছ এটা রান্না করার জন্যে আমি ডায়ালটা সেট করেছি হালকা ঝাল, ভুনা সঙ্গে আলু। সবজিটার জন্যে সেট করেছি আলু, ফুলকপি, গাজর আর বরবটি। ডাল ছিল মসুর এবং মুগ এক সাথে স্পেসিফিক গ্রাভিটি টু পয়েন্ট ফাইভ—"

মানিক হাত তুলে রতনকে থামাল, "দাঁড়াও, দাঁড়াও। তোমার গোশতে কোনো আলু নেই। কী একটা আছে এটা কার্ডবোর্ড হতে পারে, কাঁঠাল পাতাও হতে পারে। সবজিতে আলু ফুলকপি আর গাজর নেই, আবার সেই কাঁঠাল পাতা আছে। আর ডাল—"

রতন এবারে মানিককে থামাল। বলল, "এটা আসলে কাঁঠাল পাতা না। এটা হচ্ছে বাঁধাকপি। আর গোশতে আলু না দিয়ে যে বাঁধাকপি দেয়া হয়েছে তার একটা কারণ আছে। এলগরিদমে দেয়া আছে যে গোশতের পরিমাণের সাথে আলুর পরিমাণ যদি আনুপাতিক না হয় তাহলে মেশিন একটা বিকল্প সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে খানিকটা স্বাধীনতা দেয়া আছে। খাবারের পুষ্টি ক্যালোরি অপটিপমাইজেশানে—"

মানিক হাত তুলে থামাল, বলল, "তোমার বিজ্ঞানের কচকচি থামাও। তুমি আসলে রান্না কর না। তোমার যন্ত্র রান্না করে। তুমি অনেক ভালো ভালো যন্ত্র আবিষ্কার করেছ কিন্তু আমি দুঃখিত—কথাটা নিষ্ঠুর হলেও বলতে হবে, তোমার রান্না করার যন্ত্রটা ভালো হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি এই যন্ত্র চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে।"

রতন বলল, "কেন? তুমি এই কথা কেন বলছ?"

"যেমন মনে করো এই গোশতের ব্যাপারটা। এখানে সাবানের গন্ধ।"

রতন বলল, "গোশতকে সাবান দিয়ে ধুলে একটু সাবানের গন্ধ থাকতেই পারে।"

"গোশতকে কেউ কখনো সাবান দিয়ে ধোয় না। সেটা যদি ছেড়েও দেই, এই গোশত রান্না হয়নি, এটা কাঁচা।"

"খাবারকে বেশি রান্না করলে তার ভাইটামিন নষ্ট হয়ে যায়। পুষ্টি কমে আসে।"

মানিক মাথা নাড়ল, বলল, "পুষ্টির জন্যে কাঁচা মাংস খাওয়া যদি জরুরি হয় তাহলে আমি নিশ্চয়ই সারমেয় হয়ে জন্মাতাম।"

রতন ভুরু কুচকে বলল, "সারমেয় মানে কী?"

"সারমেয় মানে কুকুর। আমি কুকুর না। আমি কাঁচা গোশত খাব না।"

রতন বলল, "আমাদের খেতে হয় শরীরকে রক্ষা করার জন্যে। এই টেবিলে যে খাবার দেয়া আছে তুমি যদি নিয়মিত সেটা খাও তোমার শরীরের সকল প্রয়োজন মিটবে। কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট ভাইটামিন—"

মানিক বলল, "আমি তোমার কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট আর ভাইটামিনের শীতবস্ত্র দহন করি।"

রতন অবাক হয়ে বলল, "কী বললে?"

"আমি অমার্জিত এবং অশালীন কথা বলি না। যদি বলতাম তাহলে বলতাম আমি তোমার কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট আর ভাইটামিনের খেতা পুড়ি।"

রতন একটু অবাক হয়ে বলল, "ও! তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি আমার রান্না পছন্দ করনি।"

মানিক বলল, "বলাটা ভদ্রতা নয় কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি তোমার এই রান্না করা খাবার পুরোপুরি অখাদ্য।"

রতন একটু ইতস্তত করে বলল, "এর পুষ্টিগুণ ঠিক আছে।"

"মানুষ পুষ্টিগুণের জন্যে খায় না। একজন মানুষের জীবনে আনন্দের যে কয়টা বিষয় আছে তার মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে খাবার। আমরা মানুষ হিসেবে সেই খাবার উপভোগ করতে চাই।"

"সত্যি?"

"তুমি যদি এটা জেনে না থাকো তাহলে আমি তোমার জন্যে করুণা অনুভব করি। বিজ্ঞান যেরকম একটা বিষয়, রান্না করাও একটা বিষয়। রন্ধনশাস্ত্রের উপর কত বই লেখা হয়েছে তুমি জানো?"

"নেটে সার্চ দিয়েই তো সব রেসিপি পাওয়া যায়।"

"সেটা তুমি দিতে থাকো। কিন্তু পৃথিবীতে ভালো ভালো রেস্টুরেন্ট তৈরি হয়েছে। মানুষ সেখানে গিয়ে খাবার উপভোগ করে।"

রতনের মুখ দেখে মনে হলো এই পুরো বিষয়টা বুঝি সে এই প্রথম জানতে পেরেছে। মানিক প্লেট থেকে হাত সরিয়ে বলল, "যে খাবার খেতে ভালো না আমি সেটা খাব না। তার মাঝে যত পুষ্টিই থাকুক না কেন।"

রতন বলল, "তুমি একটা জিনিস জানো?"

"কী?"

"এই যে তুমি ভালো স্বাদের কথা বলছ সেই স্বাদটা কোথায়?"

"আমার মুখে। তুমি যদি এখনো না জেনে থাক তাহলে তোমাকে জানিয়ে দিই আমরা মুখ দিয়ে খাই। তাই স্বাদটাও আমাদের মুখে।"

রতন বলল, "তোমার ধারণা হচ্ছে আমরা মুখ দিয়ে খাই তাই স্বাদের অনুভূতিটা আসে মুখ থেকে, আসলে—"

"আসলে কী?"

সবকিছু আমাদের মস্তিষ্কে। কোনো একটা কিছু খেতে যে আমাদের ভালো লাগে তার কারণ সেটা খেতে ভালো তা নয়। তার কারণ তখন আমাদের মস্তিষ্ক আমাদের একটা সিগন্যাল দেয়। সেই সিগন্যালটা আসে নিউরনের সিনান্স কানেকশন থেকে। যখন একটা সিনান্স—"

মানিক হাত তুলে থামাল, "তোমার সিনান্সের শীত বস্ত্র দহন করি।"

রতন তখন থতমত খেয়ে থেমে গেল। মানিক বলল, "তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে আমি খাবার টেবিল থেকে উঠে হাত ধুয়ে বাইরে যাব। মোড়ের খাবারের দোকান থেকে শিক কাবাব আর নানরুটি খেয়ে বাসায় যাব।"

রতন বলল, "হুঁ।" কিন্তু তাকে দেখে বোঝা গেল সে মানিকের কথাটা শোনেনি, কিছু-একটা চিন্তা করছে।

মানিক বলল, "ইচ্ছে করলে তুমিও আমার সাথে আসতে পার। সুস্বাদু খাবার বলতে কী বোঝায় তুমি তার একটা ধারণা পাবে।"

রতন আবার বলল, "হুঁ।" এবারেও সে কিছু শোনেনি।

মানিক বলল, "আমি কি যাব? তুমি কি আমার সাথে যাবে?"

রতন আবার বলল, "হুঁ।" বোঝাই যাচ্ছে সে কিছু শুনছে না। ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে মানিক বলল, "তোমার ল্যাবরেটরির আলমারির ভেতরে কাচের বোতলে লাল রঙের কী যেন আছে। মনে হয় ভিনেগার—আমি খানিকটা ঢেলে নিয়ে গেলাম, বাসায় সালাদের মাঝে দিব।"

রতন বলল, "হুঁ।"

মানিক তখন হাল ছেড়ে দিল। কোনো এক সময় রতন তাকে বলেছিল এই বোতলে মারাত্মক কী একটা এসিড, এটার থেকে দূরে থাকতে। সেটাকে ভিনেগার হিসেবে সালাদে দেয়া নিয়ে যখন রতনের মাথাব্যথা নেই তার মানে এখন সে কিছুই শুনছে না। মানিক আগেও দুই একবার রতনকে এভাবে চিন্তায় ডুবে যেতে দেখেছে। তাই সে আর এটা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে টেবিল থেকে উঠে হাত ধুয়ে দরজা খুলে বের হয়ে গেল। রতন ঠিক একইভাবে বসে রইল।

ঠিক দুই সপ্তাহ পর মানিক রতনের একটা এস.এম.এস পেল। সেখানে লেখা, "আজ রাতে তোমার আমার বাসায় খাবার দাওয়াত। খাবার মুখে দিয়ে ভালো না লাগলে তোমাকে খেতে হবে না।"

মানিক ঠিক করেছিল রতনের বাসায় অন্য সবকিছুর জন্যে সে যাবে কিন্তু খাওয়ার জন্যে কখনোই যাবে না। রতনের এস.এম.এস. পেয়ে সে অবশ্যি তার মত পাল্টালো। মুখে দিয়ে ভালো না লাগলে খেতে হবে না এরকম কঠিন একটা কথা তো নিশ্চয়ই শুধু শুধু বলেনি নিশ্চয়ই সুস্বাদু খাবারের আয়োজন করেছে।

সন্ধেবেলা রতনের বাসায় গিয়ে মানিক দেখল খাবার টেবিলে খাবার সাজানো। মানিক ভেবেছিল রতন নিশ্চয়ই অসাধারণ কিছু খাবার রান্না করে এনেছে কিন্তু দেখল আসলে সেরকম কিছু না। আগেরবার যেরকম কড়কড়ে কিছু ভাত, ত্যালত্যালে শবজি, ম্যাড়ম্যাড়া মাংস আর জ্যালজ্যালে ডাল ছিল, হুবহু সেই একই খাবার। শুধু তাই না সবকিছুতেই সেই কাঁঠাল পাতার মতো বাঁধাকপি। মানিকের প্রথমে মনে হলো এটা নিশ্চয়ই একটা রসিকতা। কিন্তু মানিক জানে রতনের নানা ধরনের গুণ তার মাঝে ছিটেফোঁটা রসিকতা নেই। কাজেই এটা কোনো রসিকতা নয়। মানিক শুকনো মুখে বলল, "এটাই তোমার আয়োজন?"

রতন মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

"মুখে দিয়ে ভালো না লাগলে খেতে হবে না?"

"না।"

মানিক ইতস্তত করে বলল, "আমি যদি মুখে না দিয়েই বলি ভালো লাগছে না তাহলে?"

রতন ভুরু কুঁচকে বলল, "মুখে না দিয়ে কেমন করে বলবে?"

"সমস্যা কী? এর আগেরবার যখন আমাকে খেতে ডেকেছিলে কখন তুমি হুবহু এই একই খাবার দিয়েছিলে। একই রং একই চেহারা একই গন্ধ। তখন আমার খেতে যেরকম লেগেছিল এখন তার থেকে অন্যরকম লাগবে কেন?"

রতন চোখে-মুখে একটা রহস্যের ভঙ্গি করে বলল, "আগে একটু খেয়ে দেখো।"

মানিক খুবই দুঃশ্চিন্তার ভঙ্গি করে টেবিলে রাখা মাংসের বাটি থেকে চামচে করে একটু ঝোল নিয়ে মুখে দেয়ার চেষ্টা করল তখন হঠাৎ রতন "না না না" বলে প্রায় চিৎকার করে ছুটে এল। মানিক ভয় পেয়ে চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

রতন বলল, "তুমি এভাবে খেতে পারবে না। ঠিক করে বসে খেতে হবে।"

"ঠিক করে বসে? আমি শুধু একটু চেখে দেখছিলাম—"

"তুমি যদি চাখতেও চাও, ঠিক করে বসে চাখতে হবে।"

রতনের কাজকর্ম খুবই রহস্যজনক, কিন্তু মানিক বেশি অবাক হলো না। বড়ো কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আগে তার কাজকর্ম এরকম রহস্যময় হয়ে যায়। এখন মনে হয় সে তার কোনো নূতন আবিষ্কার দেখাবে কিন্তু কড়কড়ে ভাত আর ম্যাড়ম্যাড়া মাংস কী আবিষ্কার হতে পারে মানিক ভেবে পেল না। মানিক অবশ্যি কোনো প্রশ্ন করল না, একটা চেয়ারে বসতে গেল তখন রতন আবার "না না না" বলে প্রায় চিৎকার করে উঠল। মানিক আবার ভয় পেয়ে প্রায় চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"এই চেয়ারে বসো না। বসার জন্যে তোমাকে আরেকটা চেয়ার এনে দিচ্ছি।"

"মানিক অবাক হয়ে বলল, এই চেয়ারে বসলে কী হবে?"

রতন তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ভিতর থেকে আরেকটা চেয়ার নিয়ে আসে। চেয়ারটা অন্য রকম, মাথার কাছে একটা বড়ো হেলমেটের মতো। উপরে নীচে আলো জ্বলছে। চেয়ারের পিছনে একটা বাক্স দেখে মনে হয় এটা কোনো এক ধরনের কম্পিউটার। ভেতর থেকে শোঁ শোঁ শব্দ করে বাতাস বের হচ্ছে। রতন চেয়ারটা রেখে বলল, "তুমি এই চেয়ারে বস।"

মানিক একটু ভয়ে ভয়ে বলল, "আ-আমি এই চেয়ারে বসব?"

"হ্যাঁ।"

"এখানে বিদঘুটে কীসব যন্ত্রপাতি লাগানো।"

"তোমার সেটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।"

মানিক বলল, "তুমি জান আমি যন্ত্রপাতি খুবই অপছন্দ করি।"

"জানি।"

"কাজেই এই চেয়ারে এত যন্ত্রপাতি নিয়ে আমি বসতে রাজি না।"

"তোমাকে তো সারাজীবন বসতে হবে না। কিছুক্ষণ বসতে হবে। অন্য চেয়ারে না বসে এই চেয়ারে বসে খেতে হবে।"

মানিক মুখ শক্ত করে বলল, "আমি রাজি না।"

রতন অবাক হয়ে বলল, "বসতে রাজি না?"

"না।"

"কেন?"

"যদি যন্ত্রটা আমাকে কিছু করে ফেলে?"

রতন বলল, "মানিক। তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যন্ত্র তোমাকে কিছু করে ফেলবে না। তুমি এই চেয়ারে বসো, তোমার যদি এতটুকু অস্বস্তি হয় সমস্যা হয় তুমি চেয়ার থেকে উঠে এসো! কেউ তোমাকে এই চেয়ারে বেঁধে রাখছে না।"

মানিক তবুও সন্দেহের চোখে এদিক সেদিক তাকাতে থাকে। রতন বলল, "এই দেখো, আমি এই চেয়ারে বসছি।" বলে রতন চেয়ারটিতে বসে বলল, "আমার কিছু হয়েছে? হয়নি।" সে আবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তুমি এইভাবে একবার বসে দেখো।"

মানিক বলল, "ঠিক আছে। তোমাকে বিশ্বাস করে আমি এই একবার বসছি। কিন্তু জেনে রাখো এই প্রথম এবং এই শেষ।"

"ঠিক আছে।"

"আমি যন্ত্রকে ঘৃণা করি। শুধুমাত্র তোমার কারণে এরকম বিদঘুটে একটা যন্ত্রের কাছাকাছি আমি বসতে যাচ্ছি।"

"ঠিক আছে।"

"আমি ঘড়ি ধরে ঠিক এক মিনিট এই চেয়ারে বসে থাকব। তারপর উঠে যাব।"

"ঠিক আছে।"

মানিক তখন গিয়ে চেয়ারটিতে বসল, তার চোখে মুখে তখন খানিকটা বিরক্তি, খানিকটা ক্রোধ, খানিকটা যন্ত্রণা, খানিকটা তাচ্ছিল্য এবং খানিকটা অস্থিরতা। কিন্তু চেয়ারে বসার সাথে সাথে তার চোখে মুখে একটা বিচিত্র পরিবর্তন দেখা গেল। বিরক্তি, ক্রোধ যন্ত্রণা তাচ্ছিল্য অস্থিরতা সবকিছু সরে গিয়ে সেখানে এক ধরনের বিস্ময় আর আনন্দের ছাপা পড়ল। সে বুক ভরে একটা নিশ্বাস নিয়ে বলল, "অপূর্ব!"

রতন জিজ্ঞেস করল, "কী অপূর্ব?"

"তোমার রান্না। খাবারের এত সুন্দর ঘ্রাণ আমি জীবনে কখনো পাইনি! মনে হচ্ছে একেবারে স্বর্গীয়। আহা হা হা!"

রতন বলল, "তুমি বলেছ ঠিক এক মিনিট পর এই চেয়ার থেকে উঠে পড়বে। এক মিনিট শেষ হবার খুব বেশি দেরি নেই। তুমি ইচ্ছে করলে এখন উঠে পড়তে পার।"

মানিকের মুখে কেমন জানি বিহ্বল একটা হাসি ফুটে উঠল। বলল, "না রতন। আমার ওঠার কোনো দরকার নেই। খাবারের এই অপূর্ব ঘ্রাণে আমার জিবে পানি চলে এসেছে। আগে আমি খাব।"

রতন হাসি গোপন করে বলল, "ঠিক আছে।" তখন সে মানিকের সামনে আরেকটা চেয়ারে বসে পড়ল। মানিক খুব আগ্রহ নিয়ে তার প্লেটে কয়েক চামচ কড়কড়ে ভাত নিয়ে সেগুলোর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে

থাকে। তারপর পুরো প্লেটটা হাত দিয়ে নাকের কাছে এনে একটু ঘ্রাণ নিয়ে বলল, "আ হা-হা-হা! কী অপূর্ব ঘ্রাণ!"

তারপর হাত দিয়ে কয়েকটা ভাত নিয়ে মুখে দেয় আর সাথে সাথে তার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসে। ফিসফিস করে বলে, "অপূর্ব! অপূর্ব! একটা ভাতের যে এরকম স্বাদ হতে পারে আমি সেটা কোনোদিন কল্পনা করিনি! শুধু এই ভাত খেয়েই আমি দশটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারব। এই অপূর্ব চাল তুমি কোথায় পেয়েছো রতন?"

রতন সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বলল, "এই তো পেয়েছি, আর কী! যাই হোক তুমি শুধু ভাত খেয়ে পেট ভরিয়ে ফেলো না। একটু সবজি খাও। একটু মাংস খাও।"

মানিক তখন লোভীর মতো সবজির বাটিটা নিজের কাছে টেনে এনে কয়েক চামচ সবজি নিয়ে তার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তারপর খুব সাবধানে এক টুকরো বাঁধাকপি নিয়ে মুখে দিয়ে চিবুতে থাকে। খাওয়ার আনন্দে তার সারা মুখ ঝলমল করতে থাকে, ধীরে ধীরে তার চোখ দুটো আধবোজা হয়ে যায়। মানিকের মুখ দিয়ে তৃপ্তির নানা রকম শব্দ বের হতে থাকে!

রতন তাকে ডাকল, "মানিক।"

"বলো।"

"আমার রান্না কেমন হয়েছে?"

মানিকের গলা আবেগে প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। কোনোভাবে কষ্ট করে বলল, "ভাই রতন, আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। তোমার মতো এত সুন্দর করে কেউ রান্না করতে পারবে না। আমি লক্ষ টাকা বাজি ধরতে পারি, সারা পৃথিবীতে তোমার মতো এত চমৎকার কেউ রান্না করতে পারবে না।"

রতন হাসি হাসি মুখ করে বলল, "থ্যাংকু মানিক। এখন তুমি খাও।"

মানিক তখন খেতে শুরু করল, একটু একটু করে খাবার মুখে দেয় এবং সাথে সাথে তার সারা শরীর আনন্দের একটা শিহরণ বয়ে যায়। তার

চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসে আর মুখ থেকে তৃপ্তির নানা ধরনের অব্যক্ত আনন্দের অস্পষ্ট শব্দ বের হতে থাকে। রতন নিজেও খায় কিন্তু তার মাঝে সেরকম বাড়াবাড়ি আনন্দের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তার চোখে মুখে খানিকটা কৌতূহল এবং মুখে এক ধরনের হাসি তার চেয়ে বেশি কিছু সেখানে নেই।

মানিক তার খাওয়া শেষ করত বলে মনে হয় না, সে খেতেই থাকে এবং খেতেই থাকে। রতন এক সময় প্রায় জোর করে টেবিল থেকে খাবারের প্লেট আর বাটি সরিয়ে নিল তখন মানিক বাধ্য হয়ে তার খাওয়া শেষ করে চেয়ার থেকে উঠে এল। বেশি খাওয়ার কারণে মানিক খুব ভালো করে নড়তে পারছিল না, কোনোমতে এসে সে সোফায় গড়িয়ে পড়ল। বিশাল একটা অশালীন ঢেকুর তুলে বলল, "রতন, আজকে তোমার রান্না খেয়ে আমি প্রথমবার অনুভব করলাম স্বর্গীয় অনুভূতি বলতে কী বোঝায়। তোমাকে আগে আমি বেশি গুরুত্ব দেইনি, কিন্তু যে এত চমৎকার, এত অসাধারণ রাঁধতে পারে তাকে আসলে মাথায় তুলে রাখা উচিত।"

রতন সামনে আরেকটা সোফায় বসে বলল, "মানিক। আমি আসলে রাঁধতে পারি না। এর আগেরবার তোমাকে যা খেতে দিয়েছিলাম, আজকেও আমি তোমাকে হুবহু একই জিনিস খেতে দিয়েছি।"

মানিক হা হা করে হাসল। বলল, "তুমি বললেই তো আর আমাকে সেটা বিশ্বাস করতে হবে না। আমি নিজেই তো খেয়েছি, রান্নার পার্থক্য স্বাদের পার্থক্যটা তো আমি নিজে দেখেছি।"

"তুমি দেখ নাই। এখানে অন্য একটা ব্যাপার কী ঘটেছে।"

মানিক জিজ্ঞেস করল, "কী ঘটেছে?"

রতন বলল, "মনে আছে, আমি তোমাকে বলেছিলাম, স্বাদের পুরো ব্যাপারটা আসলে মুখে ঘটে না, এটা ঘটে তোমার মস্তিষ্কে।"

"বলেছিলে নাকি?"

"হ্যাঁ। বলেছিলাম। আবার বলছি। যেহেতু ব্যাপারটা ঘটে তোমার মস্তিষ্কে তাই কোনো কিছু খেয়ে সেটা ভালো লাগার জন্য আমরা সেটাকে

সুস্বাদু করে রান্না না করে মস্তিষ্কে সুস্বাদু লাগার অনুভূতি দিলে একই ব্যাপার ঘটবে।"

মানিক চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, "মস্তিষ্কে? মস্তিষ্কে অনুভূতি?"

"হ্যাঁ"

"সেটা তুমি কখন দিয়েছ?"

"আমার চেয়ার।"

"তোমার চেয়ার?"

রতন বলল, "মনে নেই তোমাকে আমি আমার ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে বসে খেতে দিইনি! তোমাকে বাধ্য করেছি আমার স্পেশাল চেয়ারে বসতে?"

"হ্যাঁ। মনে আছে?"

"এই চেয়ারটা বিশেষভাবে তৈরি। মাথার মাঝে হাই ফ্রিকোয়েন্সির ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে মস্তিষ্কের ভেতর ভালো লাগার অনুভূতি তৈরি করতে পারে!"

মানিক কিছুক্ষণ রতনের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি আমার মস্তিষ্ক অনুরণন করেছ নাকি আসলেই খাবারগুলো স্বর্গীয় ছিল আমি সেটা কোনোদিন জানতে পারব না। কিন্তু আমাকে বলতেই হবে, আজ রাতের খাওয়াটা আমার জন্য ছিল একটা স্বর্গীয় অনুভূতি।"

রতন মাথা নাড়ল, বলল, "আমি জানি। আমি নিজেকে দিয়ে পরীক্ষা করেছি। কিন্তু আমি আরো একজনকে দিয়ে ব্যাপারটা পরীক্ষা করাতে চেয়েছিলাম, তাই আমি তোমাকে ডেকে এনেছি। কাজেই এখন আমি বলতে পারি আমার এক্সপেরিমেন্ট পুরোপুরি কাজ করেছে। আমি এখন জানি কেমন করে ইচ্ছে করলেই একজন মানুষকে মজার মজার খাওয়ার অনুভূতি দেয়া যায়। ভালো করে রান্না করারও দরকার নেই, যা খুশি রাঁধতে পারো, খাওয়ার সময় শুধু মস্তিষ্কে স্বাদের অনুভূতিটা দিতে হবে।"

মানিক কষ্ট করে সোফায় সোজা হয়ে বসে বলল, "তুমি যেভাবেই বলতে চাও বলো, কিন্তু আমি তোমাকে জানাতে চাই আজ রাতের খাবারটা

ছিল একটা স্বর্গীয় অনুভূতি।"

রতন হাসল, বলল, "আমি তো কখনো স্বর্গে যাইনি তাই স্বর্গের অনুভূতি কেমন হয় এখনো জানি না।"

একটু পর মানিক জিজ্ঞেস করল, "এখন এই চেয়ারটা দিয়ে তুমি কী করবে?"

রতন বলল, "আমার কাজ শেষ তাই এই চেয়ারের আর কোনো দরকার নাই। যন্ত্রগুলো খুলে অন্য কাজে লাগাব। আমার পরের গবেষণা হবে—"

মানিক তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বলল, "কী বললে? এই চেয়ারের আর দরকার নেই?"

"না।"

"কী বলছ তুমি? তোমার দরকার না থাকলে আমাকে দিয়ে দাও। আমি নিয়ে যাব। আমার বাসায় রাখব।"

রতন হা হা করে হেসে বলল, "তুমি না একটু আগে আমাকে বলেছিলে তুমি যন্ত্রকে ঘৃণা কর! এখন তুমি এই যন্ত্র তোমার বাসায় নিয়ে যাবে?"

মানিক থতমত খেয়ে বলল, "এটা তো যন্ত্র নয়, রতন। এটা হচ্ছে স্বর্গের সাথে যোগাযোগের একটা মাধ্যম।"

রতন বলল, "সব যন্ত্রই এরকম যোগাযোগের কোনো না কোনো মাধ্যম। তুমি হয়ত আগে লক্ষ করনি।"

মানিক বলল, "ঠিক আছে। তাহলে এখন তুমি কি এই চেয়ারটা আমাকে দেবে?"

"তুমি যদি চাও অবশ্যই দেব! কিন্তু আমি তোমাকে একটা জিনিস বলি। সেটা হচ্ছে স্বাভাবিক কাজ স্বাভাবিকভাবে করতে হয়, সেখানে খামোখা যন্ত্রকে হাজির করতে হয় না! যদি ভালো খেতে চাও ভালো রান্না করা শিখে নাও, যন্ত্র দিয়ে মস্তিষ্কে স্টিমুলেশন দিও না।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে।" মানিক হাত তুলে রতনকে শান্ত করে বলল, "মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যন্ত্রের ভূমিকা এটা নিয়ে একটা গোল

টেবিল বৈঠক করা যাবে। আপাতত তুমি আমাকে এই চেয়ারটা দাও।"

"অবশ্যই দিব। কিন্তু একটা শর্ত।"

"কী শর্ত?"

"তুমি এই চেয়ার দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পার। কিন্তু অন্য কোনো মানুষকে এই চেয়ারের কথা বলতে পারবে না।"

"বলব না। আমি জানি তুমি কখনো কোনো সাংবাদিককে তোমার গবেষণার কথা বল না। বলতে চাও না।"

কাজেই সেদিন রাত্রিবেলা মানিক এই বিশেষ চেয়ারটা ঘাড়ে করে তার বাসায় নিয়ে গেল।

এরপর থেকে মানিকের দিনগুলো সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গেল। এমনিতে সে খাওয়া পছন্দ করে এখন খাওয়ার ব্যাপারটা তার জীবনের একমাত্র ব্যাপার হয়ে গেল। সকালে নাস্তা করতে বসে সে খেতেই থাকে। খাওয়ার সময় সেটা টের পায় না পরে বেশি খাওয়ার জন্য হাঁসফাঁস করতে থাকে। আগে কখনোই দুপুরে খাওয়ার জন্যে বাসায় আসত না এখন যত ঝামেলাই থাকুক সে দুপুরে খাওয়ার জন্য বাসায় ফিরে আসে। তার বাসার কাজকর্মে সাহায্য করার মহিলা ময়নার মা যেটাই রেঁধে রাখে সে খেয়ে শেষ করে ফেলে! রাত্রে বেলায় তো কথাই নেই, রান্না করা খাবার থাকলে ভালো, না থাকলেও সমস্যা নেই ফ্রিজে যা আছে মানিক কপকপ করে খেতে থাকে। এভাবে খেতে থাকলে মানিকের কয়েকদিনের মাঝে হাতির মতো মোটা হয়ে যাবার কথা। তার শরীর এত অল্প সময়ে এত খাবার সহ্য করতে পারবে কি না সেটাও একটা বিশাল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। খাবার খেতে কোনো সমস্যা হয় না, কিন্তু হজম করতে গিয়ে তার শরীর কাহিল হতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত কী হতো কেউ বলতে পারে না কিন্তু তার মাঝে হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ায় পুরো ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে গেল।

মানিক সেদিন রাতের খাবার খেয়ে সোফায় বসে একটা বই পড়ছে, ফ্রিজে খাবার নেই বলে আজকে বেশি খেতে পারেনি, তাই ভেতরে একটু অতৃপ্তির ভাব। ঠিক এরকম সময়ে তার দরজায় শব্দ হলো। দরজা খুলতেই দেখে সেখানে কালা কবি দাঁড়িয়ে আছে। কালা কবির নাম কেন কালা কবি সেটা কেউ জানে না, কারণ সে কালো না এবং কবিও না। তার গায়ের রং যথেষ্ট ফর্সা এবং সে যদিও কবি সাহিত্যিকদের জগতে ঘুরোঘুরি করে, তার চেহারা এবং ভাবভঙ্গি কবিদের মতো কিন্তু সে নিজে কোনোদিন একটা লাইন কবিতাও লিখেনি। মানুষটা ধুরন্ধর, মতলববাজ এবং অসৎ, তাকে দেখলেই সবার মুখ কালো হয়ে যায় সেজন্য হয়ত তার নাম কালা কবি। তবে শব্দটা কালো না হয়ে কেন কালা তারও ভালো ব্যাখ্যা নেই। দরজায় কালা কবিকে দেখে মানিকের মুখটা একটু কালো হয়ে গেল, সে তারপরও যতটুকু সম্ভব স্বাভাবিক থাকার ভান করে বলল, "আরে! তুমি! কী মনে করে? এসো।"

কালা কবি ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, "তোমাদের এইদিকে একটা অনুষ্ঠানে দাওয়াত ছিল। তাই ভাবলাম তোমার বাসাটা দেখে যাই।" কথাটা সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, জেনেশুনে তাকে কোনো অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়ার কথা না।

মানিক মুখে জোর করে একটা হাসি ফুটিয়ে রেখে বলল, "এসো, এসো, বসো।"

কালা কবি না বসে ঘরের ভিতরে হেঁটে হেঁটে সবকিছু দেখতে দেখতে তার সেই বিশেষ চেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, "এটা কী?"

মানিক কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, "চেয়ার।"

"চেয়ারটা এরকম কেন? এত যন্ত্রপাতি কেন?"

মানিক ইতস্তত করে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, "না মানে ইয়ে এটা হচ্ছে গিয়ে মানে যাকে বলে—একটা ডাক্তারি চেয়ার। মানে শরীরে সমস্যা থাকলে এখানে বসে, মানে ইয়ে সেই সমস্যাগুলো তখন বোঝা

যায়।" মানিক ভালো মিথ্যে কথা বলতে পারে না তাই তার কথাটা খুবই খাপছাড়া শোনাল।

কালা কবি খুবই সন্দেহের চোখে একবার মানিকের দিকে তাকাল তারপর আরেকবার চেয়ারটার দিকে তাকাল, তারপর বলল, "আমার বড়ো দুলাভাইয়ের ডায়াগনস্টিক চেম্বার আছে, আমি সেখানে এইরকম কোনো ডাক্তারি চেয়ার কখনো দেখি নাই।"

মানিক আমতা আমতা করে বলল, "এটা ঠিক বাণিজ্যিক নয়, এটা অনেকটা পরীক্ষামূলক চেয়ার। সেজন্যে মনে হয় কখনো দেখোনি।"

কালা কবি আরো সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকাল, তারপর বলল, "তোমার বাসায় পরীক্ষামূলক যন্ত্রপাতি কীভাবে এসেছে? তুমি কবি মানুষ, সবসময় বলে বেড়াও যন্ত্রপাতিতে তোমার এলার্জি—"

মানিক আবার মাথা চুলকাল, সে মিথ্যে কথা বলতে পারে না কিন্তু এখন তাকে মিথ্যা কথাই বলতে হবে, কীভাবে বলবে বুঝতে পারছে না। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, "এটা আমার ছোটো খালুর চেয়ার। তার ছেলে বানিয়ে দিয়েছে। খালুর বাসায় রাখার জায়গা নেই তাই এখানে পাঠিয়েছে।"

একটা বাসায় একটা চেয়ার রাখা যায় না এটা খুব বিশ্বাস করার মতো কথা না তাই কালা কবি আরো অনেক বেশি সন্দেহের চোখে মানিকের দিকে তাকিয়ে রইল। মানিক তখন তার কথাটা ঘুরিয়ে অন্যদিকে নেওয়ার জন্যে বলল, "তা তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো।"

বলেই বুঝতে পারল এই কথাটা বলা ঠিক হয়নি। কারণ কালা কবি তখন যে কাজটা করল তার জন্যে মানিক একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। মানিক কিছু বোঝার আগেই কালা কবি হেঁটে হেঁটে গিয়ে তার এই বিশেষ চেয়ারটাতে বসে পড়ে। মানিক অবাক হয়ে দেখল এতক্ষণ কালা কবির চোখে মুখে একটা সন্দেহ, একটা ভ্রূকুটি খেলা করছিল হঠাৎ করে তার বদলে সেখানে আনন্দের একটা ছাপ এসে পড়ল। তার চোখে মুখে আরাম আর তৃপ্তির একটা ঢেউ খেলে যেতে থাকে, মানিক দেখল কালা কবির চোখ আরামে কেমন যেন বন্ধ হয়ে আসছে।

মানিক কী করবে বুঝতে পারল না, সে যন্ত্রপাতি চালাতে পারে না বলে এটা সব সময়েই অন করে রাখা থাকে। এভাবে যে কালা কবি এখানে বসে যাবে সে একেবারেই সন্দেহ করেনি। একজন বড়ো মানুষ একটা চেয়ারে বসে গেলে তাকে টেনে ওঠানো সম্ভব না, মানিক তাই সে চেষ্টা করল না, বলল, "এখানে বসো না। উঠে আসো—তাড়াতাড়ি উঠে আসো।"

কালা কবি মধুর স্বরে বলল, "কেন ভাই? বসলে কী হয়?"

মানিক বলল, "দেখছ না কত যন্ত্রপাতি—এখান থেকে কতকিছু বের হয়। মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে।"

কালা কবির মুখের হাসি আরো বিস্তৃত হলো, সে সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "মস্তিষ্কের ক্ষতি হলে হোক। আমার কিছু আসবে যাবে না। আমি এখানেই বসব। বসে থাকব।"

মানিক নিজেই লক্ষ করেছে এই চেয়ারে বসলেই একটা আরামের অনুভূতি হতে থাকে আর খাওয়া শুরু করলে তো কথাই নেই। ভাগ্যিস কালা কবির সামনে কোনো খাবার নেই, যদি কোনো একটা খাবার থাকতো তাহলে কী হতো?

কালা কবি তার ঢুলুঢুলু চোখ খুলে বলল, "কী আরাম! আমার বাপের জন্মে কখনো এত আরাম পাই নাই। কী হয়েছে? আমার এত আরাম লাগে কেন?"

মানিক কী বলবে বুঝতে পারল না, চোখ বড়ো বড়ো করে কালো কবির দিকে তাকিয়ে রইল। কালা কবি তখন ধীরে ধীরে তার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সেখান থেকে একটা সিগারেট বের করে মুখে লাগিয়ে ফস্ করে একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে সেটা জ্বালিয়ে নিয়ে লম্বা টান দিল। মানিক দেখল সাথে সাথে কালা কবির সমস্ত চেহারা যেন আনন্দে, আরামে, সুখে, তৃপ্তিতে একেবারে একশ ওয়াট বাতির মতো জ্বলে উঠল! মানিকের আর বুঝতে বাকি রইল না এই চেয়ারের গোপন কথাটা এখন কালা কবি টের পেয়ে যাবে। সে শুনল,

কালা কবি তার সারা শরীর এলিয়ে দিয়ে গভীর আরামের একটা শব্দ করল, "আ-হ্-হ্-হ্-হ্-হ্...!"

কালা কবি কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে আবার সিগারেটে আগের থেকেও একটা লম্বা টান দিল আর মনে হলো এবারে আনন্দে, আরামে আর তৃপ্তিতে তার সারা শরীর এলিয়ে গেল। সে ঢুলুঢুলু চোখে মানিকের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই সিগারেটে কী আছে বলো তো? একেক টানে মনে হচ্ছে একেবারে স্বর্গে চলে যাচ্ছি! ব্যাপারটা কী?"

মানিক জানে ব্যাপারটা কী, কিন্তু সেটা তো আর কালা কবিকে বলতে পারে না, তাই যেটা বলতে পারে সেটাই বলল, "আমার ঘরে আমি কাউকে সিগারেট খেতে দিই না! তুমি যদি খেতে চাও বাইরে গিয়ে খাও।"

কালা কবির মুখে বিশাল একটা হাসি ফুটে উঠল, বলল, "কেন? ঘরে সিগারেট খেলে কী হয়?"

"ঘরে বোঁটকা একটা গন্ধ হয়।"

কালা কবি তখন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল, কাছে দাঁড়িয়ে থেকে খানিকক্ষণ চেয়ারের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর আবার সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে মুখ বিকৃত করে খকখক করে কেশে উঠল। বলল, "এ কী? এত মজার সিগারেটটার এই অবস্থা কেন? সিগারেট তো না মনে হচ্ছে ট্রাকের মবিল পোড়া ধোঁয়া।"

মানিক এবারে মুখ শক্ত করে বলল, "ঘরের ভেতরে না। বাইরে।"

কালা কবিও তার মুখ শক্ত করে বলল, "দাঁড়াও। আমাকে ব্যাপারটা আগে বুঝতে দাও। এই চেয়ারে বসে সিগারেট খেলে মনে হয় বেহেশতি সিগারেট আর চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেই মনে হয় মবিল পোড়া ধোঁয়া—ব্যাপারটা কী?"

মানিক বলল, "কোনো ব্যাপার নেই। রাত হয়েছে, তুমি এখন বাসায় যাও। আমার কাজ আছে।"

শুধু কথা বলেই মানিক শান্ত হলো না, সে সারাজীবন যে কাজটা করেনি সেই কাজটা করে ফেলল, কালা কবিকে সে ঠেলে ঠেলে ঘর থেকে বের করে দেয়ার চেষ্টা করল।

কালা কবি মোটেই বের হতে রাজি হলো না, সিগারেটটা হাতে নিয়ে প্রায় জোর করে আবার চেয়ারটাতে বসে গেল, তারপর সিগারেটে লম্বা আরেকটা টান দিয়ে আনন্দের একটা শব্দ করল, "আ হ্ হ্ হ্ হ্ হ্ হ্...!"

মানিক বুঝতে পারল সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। কালা কবি এই চেয়ারটা সম্পর্কে জেনে গেছে। ঠিক তাই হলো, সে ঢুলুঢুলু চোখে মানিকের দিকে তাকিয়ে বলল, "এখন আমি বুঝতে পারছি তুমি কেন এই চেয়ার নিয়ে সত্যি কথাটা কাউকে বলো না!"

মানিক কোনো কথা বলল না। কালা কবি বলল, "এই চেয়ারে বসে সিগারেট টানতেই এত আনন্দ, একটা রসগোল্লা খেলে না জানি কত আনন্দ হবে। মানিক ভাই, দাও না একটা রসগোল্লা!"

মানিক বলল, "রসগোল্লা নেই।"

"তাহলে কী আছে?"

"কিছু নেই।"

"কিছু নাই? ভাত, রুটি, ডিম?"

"না। কিছু নেই।"

"কিছু নাই?" কালা কবি একটু ব্যস্ত হয়ে বলল, "তাহলে ঐ খবরের কাগজটা দাও না।"

"কেন?"

"খেয়ে দেখব কেমন লাগে।"

"খবরের কাগজ? তুমি খবরের কাগজ খাবে?"

কালা কবি ঢুলুঢুলু চোখে বলল, "কেন? খেলে সমস্যা আছে?"

মানিক কোনো কথা বলল না, মুখ শক্ত করে খবরের কাগজটা কালা কবির হাতে ধরিয়ে দিল। কালা কবি প্রথমে খেলাধুলার পৃষ্ঠাটা ছিঁড়ে খেয়ে ফেলল। মানিক দেখল কালা কবির চোখে-মুখে আনন্দ। সে যত তৃপ্তি দিয়ে খবরের কাগজটা খেলো কোনো মানুষ এত তৃপ্তি করে কখনো রসমালাই কিংবা গুড়ের সন্দেশ খায়নি। খেলাধুলার পৃষ্ঠা শেষ করে সম্পাদকীয় পাতা, তারপর আন্তর্জাতিক খবর, সবার শেষে পত্রিকার

হেডলাইন সে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। শুধু যে খেলো তা নয়, প্রতি এক মিনিট পর পর আহা উহু করে তৃপ্তির শব্দ করতে লাগল।

মানিক বলল, "খবরের কাগজ খেয়ে ফেলাটা কিন্তু ভালো হচ্ছে না।"

সিনেমার পৃষ্ঠাটা চিবুতে চিবুতে কালা কবি বলল, "কেন? ভালো হচ্ছে না কেন?"

"খবরের কাগজ কেউ খায় না। এটা খাওয়ার জিনিস না। এটা তোমার হজম হবে না। তোমার পেটের সমস্যা হবে।"

কালা কবি বলল, "যে জিনিস খেতে এত মজা সেটা হজম হবে না কেন? একশবার হজম হবে।"

মানিক কী করবে বুঝতে না পেরে হতাশ হয়ে সোফায় বসে কালা কবির দিকে তাকিয়ে রইল।

কালা কবি খবরের কাগজ পুরোটা খেয়ে শেষ করে শেলফ থেকে সাতশ পৃষ্ঠার সঞ্চয়িতাটা নিয়ে খাওয়া শুরু করল। মানিক অনেক কষ্ট করেও তাকে থামাতে পারল না।

কালা কবি অবশ্যি পুরো সঞ্চয়িতাটা খেয়ে শেষ করতে পারল না, শেষ একশ পৃষ্ঠা বাকি থাকতেই এম্বুলেন্স ডেকে কালা কবিকে হাসপাতালে নিতে হলো। ইমার্জেন্সিতে একজন ডাক্তার ঘুম ঘুম চোখে বসেছিল কালা কবিকে দেখে উঠে এল। জানতে চাইল, সমস্যাটা কী? কালা কবি পেট চেপে ধরে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে বলল, "ব্যথা। পেটে ব্যথা!"

"কী হয়েছে। কেন ব্যথা?"

কালা কবি তখন কোনো উত্তর দিল না। মানিক বলল, "আজকের খবর কাগজ আর সঞ্চয়িতার প্রায় পুরোটা খেয়ে ফেলেছে।"

ডাক্তারের ঘুম ঘুম ভাব পুরোপুরি ছুটে গেল, "কী খেয়ে ফেলেছে?"

মানিককে আবার বলতে হলো, "আজকের খবরের কাগজ আর সঞ্চয়িতার প্রায় পুরোটা।"

ডাক্তার বলল, "খ-খ-খ—"

মানিক বাক্যটা শেষ করিয়ে দিল, "জি। খবরের কাগজ।"

"আর স-স-স—"

"জি, সঞ্চয়িতা। তৃতীয় সংস্করণ। অফসেট কাগজ—"

ডাক্তার কিছুক্ষণ কালা কবির দিকে আর কিছুক্ষণ মানিকের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

মানিক একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, "সেটা বলা সম্ভব না। যদি বলাও হয় বোঝানো সম্ভব না। যদি বোঝানো সম্ভব হয় বিশ্বাস করানো সম্ভব না। যদি বিশ্বাস করানো সম্ভব হয় গ্রহণ করা সম্ভব না। যদি গ্রহণ করানো সম্ভব হয়—"

ডাক্তার এই সময় হাত তুলে মানিককে থামিয়ে দিল।

গভীর রাতে দরজায় শব্দ শুনে রতন ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে দিল। দেখল মানিক তার চেয়ারটা ঘাড়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রতন জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার মানিক, এত রাতে?"

"তোমার চেয়ারটা ফেরত দিতে এসেছি।"

"কেন?"

"কারণটা এই মুহূর্তে বলে শেষ করা সম্ভব না। যদি বলাও হয় বোঝানো সম্ভব না। যদি বোঝানো সম্ভব হয় বিশ্বাস করানো সম্ভব না। যদি বিশ্বাস করানো সম্ভব হয় গ্রহণ করা সম্ভব না। যদি গ্রহণ করা সম্ভব হয়—"

রতন হাত তুলে থামিয়ে দিল। বলল, "বুঝেছি। এসো, ভেতরে এসো।"

মানিক ভিতরে ঢুকে ধপ করে সোফায় বসে পড়ল। একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে রতনের দিকে তাকিয়ে বলল, "মনে আছে, যন্ত্রপাতি নিয়ে আমার একটা এলার্জির মতো ছিল?"

"হ্যাঁ। মনে আছে।"

"এলার্জিটা আবার ফিরে এসেছে।"

রতন হাসি হাসি মুখে বলল, "চমৎকার!"